

tain possible Backlashes!!

EXCL

one of the officials who gave wrong information to the Prime Minister secre- during the emergency were now false evidence before the Shah mission to save their skin.... There a question of any ~~en~~enmity, these are now trying to save themselves *putting the blame on me.*"

SEPARATE PROBE FOR OFFICERS

Naturally people would like to have a separate probe for these officers to put the permanent organ of the government in per-

of the rare integrity of the statesman-politician of Bihar. The officers then tried to cultivate the 'Kripa' of four political bosses that emerged after the death of Sri Babu, they were Late B.N. Jha, K.B. Sahay, S.N. Sinha and M.P. Sinha. The arrangement continued till 1967, Ayyar Commission probed the conduct of officers in fragments & Mudholkar commission even did not touch the tip of the iceberg. Question is: Would the recently appointed Prasad Commission go into the entire gambit as to how many officers cooperated with their political bosses for perpetrating emer-

enjoyed things emergency, & am the same of cou der different. If excesses are stopped, these tuns in thep administration be ruthlessly and only ther other means, the tion could ed.

ANYBODY'S

It is anybody's as to who their political connived more loot and exco said that the have organised and they c wireless conn any political r so (for many

4
AMAYEE ASHRAM
asi-l

(last) noted below or
e of -/10/- N. P. daily
paid.

For week ending Sunday Janu

WEEKLY with a difference

Be a Member
of S P L I
if you ca
Rate of A
Annual
For 3-years
For 6-years
For 10-years

~~955~~

1/23

বেদ পরিচয়

1/23

সত্যবান

অহেন্সা নাতিহেত্রী

পুস্তক

২/১, স্ব. ম. ০৮৭ দে ট্রাট,

(কলেজ কোয়ার্টার), কলিকাতা-১২

লি গি কা

৩০/১, কলেজ রো

কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৬৭

প্রকাশিকা

অমিতা দেবী

৭৮/২/১১, বীরেন রায় রোড (ওয়েস্ট)

কলিকাতা-৩৪

মুদ্রক

শ্রীনির্মলকৃষ্ণ পাল

নির্মল মুদ্রণ

৮, ব্রজহুলাল ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

মূল্য পাঁচ টাকা

দ্রুত মুদ্রণ ব্যবস্থা করতে কিছু অপরিহার্য প্রমাদ ঘটে
গিয়েছে। তার জন্য পাঠকবর্গের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

॥ উৎসর্গ ॥

আজীবন শিক্ষাব্রতী
আমার পরমারাধ্য আচার্যদেব
স্বর্গত গোপালচন্দ্র ঘোষাল
মাতুল মহাশয়ের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে ।

—সত্যবান

॥ ভূমিকা ॥

বর্তমান সর্বাংগীন নৈতিক আখ্যাত্তর কালে মদ্যেশীয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভারতের সর্বগুণাশ্রয়, সববিদ্যাশ্রয় ও সর্বসভ্যতার আদিভূত গ্রন্থ ‘বেদ’ সম্পর্কে কিছু পরিচয় সাধনের জন্ত আমার সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ বন্ধু ছদ্মনামধারী ‘সত্যবান’কে ‘দৈনিক বসুমতী’-র ছোটদের পাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখতে অনুরোধ করি।

সেই অনুরোধ রক্ষার ফলেই এই গ্রন্থের প্রকাশ। স্বধর্মাত্মরাগী প্রকাশক এজন্ম অবশ্যই ধন্যবাদভাজন। রচনাটি ‘বেদ পরিচয়’ নামে সুদীর্ঘকাল ‘ছোটদের পাতা’য় প্রকাশিত হয় এবং কেবলমাত্র ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকেই নয়, তাদের অভিভাবক, শিক্ষক ও বহু প্রবীণ পাঠকও দিনের-পর-দিন এই রচনার অনন্তসাধারণ গুণগণনা ও সার্থকতা অসংকোচে প্রকাশ করেন পত্রের সাহায্যে।

সহজ ও সরল ভাবে চতুর্বেদের নৈষ্ঠিক পরিচয় সম্বলিত এই ‘বেদ পরিচয়’ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই যে পরম হিত সাধন করবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং এর জন্ত আমরা সকলেই ‘সত্যবান’-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

বিষ্ণুশর্মা

ছোটদের পাতা

দৈনিক বসুমতী

১৩৩, বিপিনবিহারী গাংগুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

॥ একটি পত্র ॥

ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়,

এম. এ, ডি. ফিল, ডি. লিট

অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলার মনন সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সংযোজন।
নিষ্ঠার সংগে ও শ্রদ্ধাশীল মন নিয়ে লেখক ভারতের প্রাচীন
সাহিত্যের মনিমুক্তা আহরণ করে সর্বজনবোধ্য সাবলীল ভাষায়
যে মালা গেঁথেছেন তার জন্ত লেখক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি
আগ্রহশীল বাঙালী পাঠক সমাজের সাধুবাদ অর্জন করবেন, সন্দেহ
নাই। তাঁর প্রতিটি রচনা প্রকাশ ভগীর স্বচ্ছতায় প্রাঞ্জল।
গল্প বলার একটা নিজস্ব 'ষ্টাইল' আছে। প্রাচীন সাহিত্যের
ঘনঘটার মধ্যে লেখক পথ হারিয়ে ফেলেন নি। তাকে সাধারণ
পাঠকসমাজের কাছে আরও ভাস্বর করে তুলেছেন।

স্বাক্ষর—রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৭. ৯. ৬৭

1/23

মুচীপত্র

সূচনা

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বেদ কি	১	বেদ পাঠের ফল	৫
বেদ ও শিক্ষা	২	লিখিত বেদ ও বেদের	
বেদ অপৌরুষেয়	৩	বিভাগ	৬
দেবতা শব্দের অর্থ কি	৪	বেদব্যাস কি মুনি	৭
বেদে আর কি আছে	৫	হিন্দু ও বেদ	৭

সত্যযুগ

মুনি কে আর ঋষি কে	৯	কামধেনু রূপকের ভেদ—	
মুনি ও ঋষির বিরোধের		কহোজ সৈন্য	১৮
কারণ	১১	অথর্বা ও বশিষ্ঠ	২০
পৃথিবী কি কামধেনু	১৩	কামধেনু রূপকের ভেদ—	
কামধেনু রূপকের ভেদ—		কৃষক ও বশিষ্ঠ	২১
পঙ্কজ সৈন্য	১৪	সিন্ধু-হিন্দু ইণ্ডো-শিটো	২১
বেদের সংগে পুরাণাদির		কামধেনু—চাষের জমি	২২
সম্বন্ধ	১৪	বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ	২৩
বরুণ ও মিত্রের কাহিনী	১৫	মুনি ও ঋষিদের সমন্বয়	২৫
অথর্বা ও বশিষ্ঠ	১৬	মন্ত্রগুপ্তি-ব্রহ্মবিদ্যা কৃষিবিদ্যা	২৬
বশিষ্ঠ ও বরুণ	১৭	বিশ্বামিত্রের মন্ত্রলাভ	২৮
বিশ্বামিত্র ও মিত্র	১৭		

ত্রেতাযুগ

মুনি ও ঋষির সমন্বয়ের ফল	৩১	বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও রাম	৩৩
সূর্যবংশ	৩২	কৃষি ও ঋষি	৩৫
সৌরমাস ও চান্দ্রমাস	৩৩	ঋষি ও ব্রাহ্মস	৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কৃষি ও মুনি	৩৬	পরশুরামের পরাজয়ের	
পৃথিবী - মা	৩৭	আনুমানিক কারণ	৪৭
বিশ্বামিত্রের তপস্যা	৩৮	রাবণের দশমুণ্ডের রহস্য	
যজ্ঞের অর্থ	৩৯	ভেদ	৪৮
ব্যক্তিবাদ ও বিশ্ববাদ	৪০	রাবণ ও মাতৃগতকুল	৪৯
রামের আরও শিক্ষা ও		গণ ও প্রতীক	৪৯
সাধনা	৪১	গণশক্তি	৫০
অহল্যার রহস্য ভেদ	৪৩	লংকাদহনের রহস্য	৫০
কৃষির প্রসার	৪৩	ব্রহ্মাস্ত্ররহস্য	৫০
জনক ও সীতা	৪৪	সীতাহরণ রহস্য	৫১
পরশুরাম-পিতৃগতকুল	৪৫	রামের আদর্শ	৫১
গোত্র ও প্রবর	৪৭		
		দ্বাপরযুগ	
রাম ও বেদচর্চা	৫৩	বেদ সংকলনের আনুমানিক	
শৃঙ্গ কারা	৫৩	কারণ	৬৩
শৃঙ্গ সমস্যা	৫৪	কুষের গুটতত্ত্ব	৬৩
যজ্ঞের বিশ্লেষণ	৫৫	গোবর্ধন ধারণের রহস্য—	
শৃঙ্গবিদ্রোহ	৫৭	ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব	৬৪
বেদের বিভাগ—ব্রাহ্মণ	৫৮	ঐ—কুষের গোপালত্ব	৬৬
আরণ্যক	৫৮	হিংসা ও অহিংসা	৬৭
উপনিষৎ	৫৯	জৈনধর্মের মূলকথা	৬৭
বেদের উদ্ভব রহস্য	৫৯	বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা	৬৮
কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড	৬০	কপিল ও বুদ্ধদেব	৬৯
ষড়্ দর্শন	৬০	জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য	৭০
আধ্যাত্মিকতা কি	৬১	বৈদিক যুগে বিতাদানের	
মুনিপ্রতিষ্ঠিত চন্দ্রবংশ	৬২	পদ্ধতি	৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্নের তত্ত্ব	৭২	ভক্তির রহস্য	৭৯
বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন	৭৩	রাম ও কৃষ্ণের তুলনা	৮০
চন্দ্রবংশের অভ্যুদয়	৭৩	ভূ-ভার হরণ কি	৮০
জাতিবিরোধ ও প্রতারণা	৭৪	যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া	৮১
বৈদিক যুগে পাশাখেলা	৭৬	কলিযুগের সূচনা	৮২
কৃষি থেকে রাজ্য	৭৭	আত্মক্ষয়ী বিরোধ	৮৩
গীতার তত্ত্ব	৭৮		

কলিযুগ

ঐক্যের চেষ্টা	৮৪	বেদ ও তত্ত্ব	১০৩
শিবলিংগের উদ্ভব	৮৫	বেদাংগের উদ্ভব	১০৪
ঐক্যের প্রতীক সরস্বতী	৮৫	বেদাংগ-ছন্দঃ	১০৫
বৈদিক যুগে অনৈক্য	৮৬	ঐ—কল্প	১১০
বিদ্যার মধ্যে বিরোধ	৮৮	ঐ—জ্যোতিষ	১১০
অনৈক্যের ফল—বিছালোপ	৯০	ঐ—নিরুক্ত	১১১
অবৈদিক ধর্মের অভ্যুদয়	৯০	ঐ—শিক্ষা	১১১
বেদব্যাসের আরও কীতি—		ঐ—ব্যাকরণ	১১২
পুরাণ সংগ্রহ	৯১	সূত্রাকারে বেদাংগ রচনার	
পুরাণাদির মূলকথা	৯২	ফল	১১৩
কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টির		ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রচর্চা	১১৪
উপাদান	৯৩	বেদাদি ব্যাখ্যায় যুক্তির	
সূত্রগ্রন্থ ও স্মৃতিশাস্ত্র	৯৪	প্রয়োগ	১১৪
স্মৃতিশাস্ত্র কথিত বর্ণাশ্রমের		মতান্তরের ফল	১১৫
গুঢ় রহস্য	৯৫	উপবেদ কি কি	১১৬
স্মৃতিশাস্ত্রে আর কি আছে	৯৭	পঞ্চম বেদ—নাট্যবেদ	১১৬
সূত জাতির বৈশিষ্ট্য	৯৮	কাব্য ও অলংকার শাস্ত্র	১১৭
উপনিষদের কথা	৯৯	কবি ও কবিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব	১১৮
বেদের প্রসারে বাধা	১০০	মুনিরাই কি কবি	১১৯
বেদের শাখাভেদ	১০১	ঋষি ও মুনির উপাধির	
অথর্ববেদের প্রসার	১০১	সম্বয়	১২০
বেদের শাখাভেদের ফল	১০২	ভৃগুবংশের বৈশিষ্ট্য	১২১
বেদ শিক্ষার বিপর্যয়	১০২		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মুনি ও ঋষির জীবনযাত্রা	১২২	মুসলমানদের শাসনকালে	
পাতাল কি আর স্বর্গই		বেদচর্চার বিপত্তি	১৩২
বা কি	১২৩	শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের	
তামিল বা দ্রাবিড় সভ্যতা	১২৩	পুনরুত্থাদয়	১৩৩
রাফস কবি—রাবণ	১২৪	মরমিয়া সাধকদের চেষ্টা	১৩৩
কবি শুক্লাচার্যের কাব্য-		বেদচর্চার ক্রমবিলুপ্তি	১৩৪
ধারার লোপ হলো		জীবিকাকেন্দ্রিক বিচার	
কেন	১২৫	উপযোগিতা	১৩৫
কাব্যের প্রসার ও বৈচিত্র্য	১২৬	ইংরেজদের আগমনে	
নাট্যাভিনয় কাদের দান	১২৭	দেশের নব জাগরণ	১৩৬
বিচার নানা শাখাভেদ	১২৭	বেদচর্চার ছরতিক্রম বাধা	১৩৭
বেদ চর্চার অন্তর্বিধা	১২৮	বেদচর্চার বাধা দূর করার	
সম্প্রদায়ভেদ ও মতভেদ	১২৯	পায়	১৩৮
বেদচর্চার অভিনব প্রয়াস		এশিয়াটিক সোসাইটির	
আচার্য সায়ণের কীর্তি	১৩০	প্রতিষ্ঠা ও ফল	১৩৯
আচার্য শাকল্যের পদপাঠ	১৩১	বর্তমানে বেদচর্চা	১৪০
আচার্য সায়ণের ভাষ্য-		বেদের নিগূঢ় শিক্ষা ও	
রচনার বৈশিষ্ট্য	১৩২	উপসংহার	১৪০

পরিণিষ্ট

উপনয়ন সংস্কার	১৪৭	পূর্ণ গায়ত্রী	১৫৩
দ্বিজত্বের রহস্য	১৪৭	গায়ত্রী নামের অর্থ	১৫৪
সম্ভাব্যবিধির প্রয়োজন	১৪৯	প্রণব ও ব্যাক্রতির উদ্ভব	১৫৪
ত্রিসবন ও ত্রিসম্বা	১৪৯	ব্রহ্মবিচার বিভিন্ন নাম ও	
গায়ত্রীর অর্থ	১৪৯	কারণ	১৫৪
প্রেরকের প্রয়োজন	১৫০	প্রণবের রহস্য	১৫৫
গায়ত্রী মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য	১৫০	সার কথা	১৫৬
গুরু মহত্ব	১৫১	জপের ফল	১৫৬
সবিতার প্রয়োজন	১৫১	প্রাণায়ামের ফল	১৫৭
জীবনের ক্ষেত্র ও বিস্তার	১৫২	নিয়মিত অভ্যাস	১৫৭
ত্রিবিৎকরণের রহস্য	১৫২	পরম গতি	১৫৭

বেদ - পরিচয়

সূচনা

বেদ কি?

বেদ শব্দটির অর্থ হচ্ছে—জ্ঞান। সেদিক থেকে বিচার করলে—এ জগতে আমরা যা কিছু জানতে পাই, তা শুনেই হোক আর দেখেই হোক—সবই বেদ বা জ্ঞান।

এককালে বেদের অপর নাম ছিল ঋগ্‌ভি। সেই কালে বেদ কেবল শুনেই শিখতে হত।

বেদ শব্দটির বানানে আছে দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ, সেই দুটিকে উর্ধ্বে বসালেই 'বেদ' শব্দ থেকে 'দেব' শব্দ পেয়ে যাই। আগেকার দিনে যারা বেদ নিয়ে চর্চা করতেন, অর্থাৎ বিদ্বান ছিলেন, তাঁদের এক নাম ছিল দেব। যারা তা করত না তারাই অ-দেব-নামে পরিচিত ছিল।

বেদ কথাটি প্রথম শিখেছিলাম ছেলেবেলায় পাঠশালায় ভর্তি হয়ে। তখন পাঠশালার ছুটির আগে সবাই দাঁড়াতে সার বেঁধে

গুরুমশায়ের সামনে সর্দার পড়ুয়ার হাঁক শুনে স্তব্ধ করে
পড়তাম—

একে চন্দ্র, দু'য়ে পক্ষ

তিনে নেত্র, চারি বেদ...

সেই চারটি বেদ যে কি কি, তা তখন জানতাম না।

ক্রমে পাঠশালার দিন শেষ হলো। শুরু হলো ইস্কুলে পড়া।
ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে পেলাম সংস্কৃতপাঠে। সেই সময়ে একদিন
পণ্ডিতমশাই জানিয়ে দিলেন চারি বেদের নাম—ঋক্, যজু, সাম ও
অথর্ব। কিন্তু কেন বেদের ঐ চারটি নাম হলো, তা তখনো জানতে
পারিনি।

প্রায় সেই সময়েই আমার উপনয়ন সংস্কার হলো। আচার্য হয়ে
যিনি আমায় সাবিত্রীদীক্ষা দিলেন, মানে গায়ত্রীমন্ত্র শিখিয়ে তা
জপ করার বিধান বুঝিয়ে দিলেন তাঁরই কাছে জানলাম যে, ঐ
গায়ত্রীমন্ত্র এবং তার সঙ্গে যুক্ত আত্মিকক্রিয়ার প্রায় সমস্ত মন্ত্রই
হচ্ছে বেদের অংশ। তার মধ্যে অবশ্য মূলমন্ত্র হচ্ছে গায়ত্রী—সে
মন্ত্রের ঋষি হচ্ছেন বিশ্বামিত্র। ঋষি বিশ্বামিত্র সম্পর্কে আরো
অনেক কথাই আমরা ক্রমশঃ জানতে পাব।

আচার্য আরো বোঝালেন যে, 'গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতঃ' অর্থাৎ
গায়ত্রীই ছন্দসকলের, কিনা বেদের জননী। কিন্তু গায়ত্রীর কথা
এখন থাক—যখন পরে বেদে প্রবেশ করার কথা উঠবে
তখন এই গায়ত্রী সম্বন্ধে আরো দিশা পাব। এখন বেদের কথাই
বলি।

বেদ ও শিক্ষা

আসলে বেদ হচ্ছে শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত। শিক্ষাদানের মূল
উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রের মনের প্রশার বৃদ্ধি করে দেওয়া। আগেকার
দিনে বেদকথার মাধ্যমেই ছাত্রের জ্ঞান-উন্মেষের ব্যবস্থা করা

হত। প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যে স্বাভাবিক স্মৃতি প্রকৃতি আছে তারই পূর্ণবিকাশ ঘটত সেই পথে।

আজকের দিনে শিক্ষার ধারা নানা কারণে পাল্টে গিয়েছে। তাই দেখা যায় শিক্ষকেরা ছাত্রদের কেবল আংশিক বিকাশের ব্যবস্থাটুকুই করতে পারেন। শিক্ষাদান তাই আজ মহা সমস্যা হয়ে উঠেছে। দেশ-বিদেশের গুণী-জ্ঞানীরা তাই চিন্তা করছেন কি উপায়ে প্রত্যেক ছাত্রের স্বভাবকে প্রস্তুতি করে তোলা যায়। বেদের মধ্যে নিহিত আছে, শিক্ষাদানের সেই সার্থক পদ্ধতি। কিন্তু উপযুক্ত চর্চার অভাবে সেই পদ্ধতি প্রায় লোপ পেতে বসেছে।

পণ্ডিতজনেরা কিন্তু বলেন যে, বেদ নিত্য অর্থাৎ চিরকাল থাকবে। অবশ্য এও তো মিথ্যে নয় যে, জগতে যতগুলি প্রাচীন পুস্তক আছে, আমাদের বেদ তাদের কোনটির থেকে কম দিনের নয়। এখনো সেই বেদ আছে আর তার চর্চাও আছে। যদিও রুচির পরিবর্তন ঘটায় প্রত্যেক ভারতবাসী আজকে আর বেদ নিয়ে চর্চা করেন না।

বেদ অপৌরুষেয়

পণ্ডিতজনেরা আরো বলেন যে, বেদ চিরকাল থাকবে। তার কারণ, বেদ হচ্ছে অপৌরুষেয়। অর্থাৎ এ কোন সাধারণ মানুষের কৃত নয়—স্বয়ং ঈশ্বরের কৃত।

এই অপৌরুষেয় শব্দটির নিগূঢ় অর্থ কি ?

যা কোন পৌরুষ বা ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা লাভ করা যায় না তাই হচ্ছে অপৌরুষেয়। আচ্ছা, কবি যে কবিতা লেখেন তাও কি অপৌরুষেয় নয় ? কোন ব্যক্তি কি নিজের চেষ্টায় মিলটন অথবা রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে পারে ? না, তা কখনই সম্ভব নয়। তাই কবিত্ব-শক্তিকে বলা হয় ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা।

এখানে একটি গল্প বলি। একবার কোন এক ইংরেজ কবিকে

তাঁর পাঠকরা জানালেন—“দেখুন, আপনার এই কবিতাটির অর্থ বোঝা যাচ্ছে না। দয়া করে অর্থ করে দেবেন কি?”

কবি হেসে বললেন—“দেখ বাপু, এ কবিতা যখন লিখেছিলাম তখন অবশ্য এর অর্থ আমি জানতাম আর ঈশ্বরও জানতেন। কিন্তু ভারি ছুঃখের কথা উপস্থিত আমি অর্থটি বেবাক ভুলে গিয়েছি। তবে ঈশ্বরের নিশ্চয়ই মনে আছে।”

গল্পটি শুনে মনে হয়—কবি বুঝি ঠাট্টা করছেন তাঁর পাঠকদের। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। এমন ব্যাপার সত্যিই হয়। আমাদের দেশের অনেকেই জানেন যে—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতার অর্থ নিয়েও এমনি সমস্যা দেখা দিয়েছিল—তখন কবিকেই অনুরোধ করা হয়েছিল অর্থ করে দেবার জন্য। কবি তখন সবিনয়েই জানিয়েছিলেন যে, “কোন ভাবে ভাবিত হয়ে কবে কোন কবিতা রচনা করেছি, আজ আর আমার তা স্মরণে নেই।”

কথাটি সত্য। কবি লেখেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টি বা প্রেরণার বশে। সেই প্রেরণা বিদ্যুৎচুম্বকের মতই ক্ষণস্থায়ী। পলকের দেখা পলকেই যেন হারিয়ে যায়। বেদেও প্রত্যেক মন্ত্রে বা সূক্তে যে ঋষিদের নাম পাই, তাঁদের বলা হয় মন্ত্রদ্রষ্টা। অর্থাৎ বিশেষ এক অন্তর্দৃষ্টি বা প্রেরণার বশেই তাঁরা সেই মন্ত্রের দেবতাকে দেখেই মন্ত্রগুলি লাভ করেছিলেন। সেই দেবতাই হচ্ছেন মন্ত্রের বিষয়বস্তু।

দেবতা শব্দের অর্থ কি?

দেবতা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে ‘দিব্’ ধাতু থেকে, তাই দেবতা শব্দের অর্থ হচ্ছে—দ্যুতিমান্ বা দীপ্তিমান্। তাই তো এই কথাই মনে হয় যে, মন্ত্রের বিষয়টি বিদ্যাভ্যাসের আলোর মতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মানসলোকে।

এই তো হয়। কবি প্রভৃতি মনীষীদের বলা হয়—প্রতিভাশালী ব্যক্তি। এই প্রতিভা শব্দটি প্রতিধ্বনি, প্রতিবিম্ব, প্রতিক্রিয়া

প্রভৃতি শব্দগুলির মত একটি মূল ক্রিয়ার অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। বেদে পাই—কবি শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈশ্বর। এই বিরাট বিশ্ব তাঁর রচিত কাব্য। যাঁরা সাধারণ কবি তাঁরা তো সবাই সেই আদি কবি ঈশ্বরের নকলই করেন তাঁদের কাব্যে বা নাটকে। সুতরাং বেদ তো অপৌরুষেয় বটেই।

বেদে আর কি আছে ?

বেদের মধ্যে আরো পাই, আমাদের এই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার পরিচয়—তখনকার ধর্মনীতি, সমাজবিধি ও শাসনব্যবস্থার মূল। বর্তমানকালের হিন্দুধর্মও এই বেদ থেকেই উদ্ভূত।

পণ্ডিতজনেরা আরো বলেন—বেদ হচ্ছে আর্থজাতির কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের পরিচায়ক। আর্থ শব্দটি এসেছে অর্থ শব্দ থেকে। আচার্য যাস্ক বলেন, অর্থ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈশ্বর বা প্রভু। তাই বলা চলে—যাঁরা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বা প্রভুবান্ তাঁরাই হচ্ছেন আর্থ। আর্থ শব্দে আবার শিক্ষিত বা জ্ঞানীও বোঝায়।

বেদ পাঠের ফল

যাই হোক, এখন কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, বেদের চর্চা ও প্রচার যত বেশী হবে তত আমরা জানতে পারব অতীতের ঐতিহ্য, আমাদের পিতৃপুরুষদের পরিচয়। যে মানুষ অতীত ঐতিহ্যধারাকে সম্পূর্ণ করে জানতে পান, তিনিই পারেন সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করতে তাঁর বর্তমান পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিককে আর তারই ফলে গড়ে তুলতে পারেন তাঁর ভবিষ্যৎকে।

আগেকার কালের মুনি-ঋষিদের সবাইকেই আমরা ত্রিকালজ্ঞ বলে জানি। কেননা তাঁরা তাঁদের স্বচ্ছ চিন্তার মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের ধারণা করতে পারতেন। আর পারতেন তার প্রয়োগ করতে। যে পরিকল্পনা তিন কালের বিচারে

উদ্ভীর্ণ নয়, তা কখনো শুভ ফল প্রসব করে না। কিন্তু সে কথা থাক। শুধু বলে রাখি—এই ত্রিবৃৎকরণ বা তিন কাল, তিন কর্ম ও তিন গুণের প্রয়োগ আমরা বেদ আলোচনার মধ্যে বহুবার দেখতে পাই।

লিখিত বেদ ও বেদের বিভাগ

আমাদের কালে বেদ কিন্তু আর শ্রুতি নয়। লিখিত পুস্তক রূপেই আমরা এখন বেদ দেখতে পাই। এই লিখিত বেদ সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় বেদব্যাসকে। মহাভারতে দেখি—ঐ বেদব্যাস মুখে মুখে শ্লোক রচনা করছেন, আর তার শ্রুতিলিখন করছেন গণেশ। তাই সন্দেহ জাগে যে, ঐ গণেশই বেদব্যাসকে বেদ লিখতে সাহায্য করেছিলেন। এ সন্দেহ আরো দৃঢ় হয় এই কারণে যে, বর্তমানে প্রচলিত বেদের হস্তলিখিত পুঁথির শুরু হয়েছে “ওঁ গণেশায় নমঃ” লিখে।

পুরাণ থেকে পাই—যতদিন বেদব্যাস বেদমন্ত্রগুলিকে বিভাগ করে চারিটি নামে সংকলন করেন নি, ততদিন একত্রিত সমগ্র বেদমন্ত্রগুলির একটি মাত্র নাম ছিল—যজুর্বেদ। মহামুনি বেদব্যাস, হ্যাঁ, মহামুনিই তিনি, যাঁর আদি নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কি ভাবে মন্ত্রগুলি বিভাগ করেন তাই বলি।

যে মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করার যোগ্য সেগুলিকে ঋগ্বেদের ভাগে, যেগুলি যজ্ঞে ব্যবহার বা প্রয়োগ করার যোগ্য সেগুলিকে যজুর্বেদের ভাগে, যেগুলি গান করার যোগ্য সেগুলিকে সামবেদের ভাগে, আর বাকী যা কিছু বিচিত্র বিভিন্ন মন্ত্র সবগুলিকে অথর্ববেদের ভাগে রাখলেন তিনি। এই কীর্তির জন্তেই তিনি বেদব্যাস বা বেদের বিভাগকর্তা নামে বিখ্যাত।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, প্রত্যেক ভাষাতেই রচনার তিনটি রীতি আছে, যথা—পদ্য, গান ও গদ্য। বেদের ভাষার মধ্যে সেই

তিন রীতি লক্ষ্য করেই বেদব্যাস বেদ বিভাগ করেছেন—পদ্যগুলিকে ঋক্, গানগুলিকে সাম ও গণগুলিকে যজুঃ নামে চিহ্নিত করে।

বেদব্যাস কি মুনি ?

কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে কেন মহামুনি বলছি ? সাধারণতঃ তাঁকে তো সবাই মহর্ষি বলেই উল্লেখ করেন। বেদব্যাসকে মহর্ষি আখ্যা দিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মুনিবংশের লোক। প্রমাণ পাই গীতাতৈই। বিভূতির কথা বলতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে অর্জুনকে বলছেন—

“মুনীনামপ্যহম্ ব্যাসঃ।” অর্থাৎ মুনিদের মধ্যেও আমি ব্যাসরূপে প্রকটিত।

আবার বংশবিচার করলেও দেখি—ব্যাস পরাশরের পুত্র, পরাশর শক্তির পুত্র, শক্তি বশিষ্ঠের পুত্র। বশিষ্ঠ যে মুনি ছিলেন তার আরো প্রমাণ পুরাণাদি শাস্ত্রে আছে। এই মুনি বশিষ্ঠের সঙ্গেই কঠিন বিরোধ বেধেছিল ঋষি বিশ্বামিত্রের কামধেনুর অধিকার নিয়ে। সে কাহিনীও পুরাণে আছে।

তাই বড় আশ্চর্য মনে হয় যে, যদিও বেদমন্ত্রের দৃষ্টা হলেন ঋষিরা—মুনিরা করলেন সেই মন্ত্রগুলির সংকলন ও বিভাগ। অথচ একদিন মুনিদের সঙ্গে ঋষিদের ছিল প্রবল বিরোধ। তবে কেন মুনিরা ঋষিদের মন্ত্র সংকলনের কাজ করতে গেলেন ?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে মুনি ও ঋষির সম্বন্ধে শাস্ত্রে যা কিছু বলা হয়েছে। সে কথা থেকেই শুরু হবে এ পুস্তকের বক্তব্য।

হিন্দু ও বেদ

প্রসঙ্গতঃ বলি—হিন্দু শব্দটিও বেশ প্রাচীন। বিভিন্ন ভাষাভাষীর উচ্চারণ বিপর্যয়ে সিন্ধু শব্দই ‘হিন্দু’ হয়ে উঠেছে। এমন

উচ্চারণ আজও বাংলা দেশের অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত। সেখানে 'স'-কে 'হ' বলা হয়ে থাকে। এখন যদি হিন্দুধর্ম বা হিন্দুসভ্যতা শব্দ দুটিকে তাদের সেই আদিরূপে লিখি বা উচ্চারণ করি, তাহলে সিদ্ধধর্ম বা সিদ্ধ সভ্যতা শব্দ দু'টিই পাই। তবে কি এইই সত্য যে, বর্তমান পঞ্জাব অঞ্চলের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো খনন করে প্রত্নতাত্ত্বিকরা যে সভ্যতার নিদর্শন বের করেছেন, বেদ তারি সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ?

এখানে একটি কথা বিশেষ করে মনে করিয়ে দিই যে, সিদ্ধ শব্দটি বেদের মধ্যে সর্বদাই নদী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর নদী যে কৃষিকর্মের কত বড় সহায় তা কৃষিবিদ্যে মাত্রেই জানেন। মানুষের সভ্যতা যতদিন কৃষিকর্মের আবিষ্কার করতে পারেনি, ততদিন সে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নি—এ সত্য সভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তাই বেদে সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ খুবই অর্থপূর্ণ।

সত্য যুগ

মুনি কে আর ঋষি কে ?

বদি অর্থের দিক দিয়ে বিচার করা যায়, তাহলে জানা যায় যে, মুনি হচ্ছেন যিনি মৌন থাকেন, কথা বলেন না, আর ঋষি হচ্ছেন, যিনি কথা বলেন।

ঋগ্বেদের মুনিসূক্তে পাই—“মুনয়ো বাতরশনাঃ”—মুনিরা বায়ু আহার করে থাকেন, বায়ু আহার করার গূঢ় অর্থ কি ? আচার্য পাণিনি তাঁর ব্যাকরণের অন্তর্গত শিক্ষাঅধ্যায়ে বলেছেন যে, বাক্য মাত্রেই উচ্চারিত হয় মারুত প্রেরিত হয়ে। আমরা যে কথা বলি, তার মূলে আছে ঐ মারুত বা বায়ুর প্রেরণা। সমস্ত শব্দই জগতে বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই বায়ুকে যদি খেয়ে ফেলেন কেউ অর্থাৎ বায়ুর প্রকাশের পথ রোধ করে দেন তাহলে আর কি করে তিনি কথা বলবেন ? এমনিতেও দেখা যায়—কেউ যদি দম বন্ধ করে থাকে, তবে সে আর কথা কইতে পারে না। তাই বেশ বোঝা যায় যে, মুনিরা বায়ু আহার করতেন মানে হচ্ছে, তাঁরা কথা কইতেন না।

এই সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আমাদের শাস্ত্রে আছে। সেটি এই—বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্র দুজনেই বিড়িলাভ করবার জন্য ইন্দ্রের তপস্বী করেন। বৈদিক যুগে সবকিছুর জন্যই ইন্দ্রের তপস্বী করা

হত—সে কথা আমরা বেদসম্বন্ধে যতই চর্চা করব ততই জানতে পারব। যাই হোক, তপস্যার ফলে বশিষ্ঠ ইন্দ্রের দর্শন লাভ করলেন এবং পেয়ে গেলেন মননশক্তি। এই মননশক্তিও হচ্ছে মুনিদের বিশেষ গুণ। গীতায়ও তাই বলা হয়েছে—“স্থিতধীমূনিরূঢ়্যতে”—অর্থাৎ যাঁর বুদ্ধি স্থির হয়েছে (মননশক্তি লাভ হয়েছে) তাঁকেই মুনি বলে। বশিষ্ঠ তাই মননশক্তি লাভ করে মুনি নামে বিখ্যাত হলেন।

বিশ্বামিত্র কিন্তু দর্শন লাভ করতে পারলেন না ইন্দ্রের, তাহলেও পেয়ে গেলেন বাকশক্তি। সেই বাকশক্তি বলেই বিশ্বামিত্র ঋষি হয়ে উঠলেন। এই ঋষিরাই উদ্ভাবন করলেন নানা ছন্দের, নানা সুরের এবং শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন বেদমন্ত্র।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যখন আমরা কোন বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিই, তখন সত্যিই কথা কইতে ভাল লাগে না—পাছে মনোযোগ ভেঙ্গে যায়। আবার দেখা যায়, যাঁরা কর্ম করছেন, তাঁরাও চান না সহজে কথা বলতে—কথা কইলে কাজ করার দম কমে যায় বলে। কাজের সময় কথা বললে তা ঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। তাহলে কি এই সত্যি যে, মুনিরাই ছিলেন কর্মী আর ঋষিরাই ছিলেন জ্ঞানী? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা ক্রমশঃ জানতে পাব।

ঋগ্বেদের মুনি-স্মৃতিে আমরা আরো যা পাই তারও উল্লেখ করে রাখি। সেখানে আছে—

“অন্তরীক্ষেণ পততি

বিশ্বারূপাবচাক্ষণং ॥”

খা—১০।১৩৬।৪

মুনি পারেন অন্তরীক্ষে উড়ে বেড়াতে, পারেন বিশ্ব যতকিছু রূপ সবই দর্শন করতে।

আবার পরের ঋকৃটিতে পাচ্ছি—

“বাতস্তাশ্বো বায়োঃ সখা

অথো দেবেষিতো মুনিঃ ॥

উভৌ সমুদ্রাবাক্ষেতি

যশ্চ পূর্ব উতাপরঃ ॥

মুনি পারেন অশ্বের মতই বায়ুপথে বিচরণ করতে, বায়ু তাঁর সখা। তাই দেবতারাও মুনিদের খুঁজে বেড়ান। দুটি সমুদ্র, যার একটি পূর্বে আর একটি পশ্চিমে জেগে আছে—মুনি সেই দুই সমুদ্রেই বাস করেন।

মুনি ও ঋষির বিরোধের কারণ

এখন বলি—কি নিয়ে বিরোধ বেধেছিল সেই আদি যুগে মুনি আর ঋষির মধ্যে। বিভিন্ন পুরাণে সেই বিরোধের বর্ণনা আছে।

পুরাণের উপাখ্যানটি এই—বিশ্বামিত্র তখন রাজা। বেরিয়ে-ছিলেন বহু অনুচর নিয়ে যুগয়ায়। কিন্তু সারাদিনের চেষ্টায় কোন জন্তু শিকার করতে পারেন নি। তৃষ্ণায় ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে তিনি অনুচরদের নিয়ে পৌঁছলেন বশিষ্ঠের তপোবনে। বশিষ্ঠ পরম যত্নে অতিথি সৎকার করলেন। ভূরিভোজনে তৃপ্ত হলেন বিশ্বামিত্র ও তাঁর অনুচরেরা। কিন্তু বিশ্বামিত্রের মনে প্রশ্ন জাগলো—“এই বনচারী তপস্বী কি করে পারলো আমাদের সবাইকে এমন ভূরিভোজ দিতে? কি সহায় আছে তার, কি সম্বল?”

উত্থাপন করলেন তিনি সেই প্রশ্ন বশিষ্ঠের কাছে। বশিষ্ঠ জানালেন—“তপস্তার জন্তু আমার একটি কামধেনু আছে, তারি কুপায় আমি তোমাদের সেবা করতে পেরেছি।”

লোভ হলো বিশ্বামিত্রের—এমন ধেনু তাঁর কেন হবে না, তিনি যখন রাজা! বললেন, “ঐ ধেনুটি আমায় দাও। তার বিনিময়ে তোমায় অসংখ্য ধেনু দেব, সোনা যুড়ে দেব তাদের শিং।”

বশিষ্ঠ শাস্ত্রভাবেই বললেন, “তা কি করে হয়? ধেনু গেলে আমার তপস্কার বিন্ধ হবে।”

বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন, “যদি স্বেচ্ছায় না দাও, আমি বলপ্রয়োগ করে নিয়ে ঘাব।”

বশিষ্ঠ স্মিতহাস্য করলেন, বললেন, “তুমি রাজা, বলবান, তোমার সঙ্গে অস্ত্রধারী অনুচর রয়েছে। আমি তো তোমায় বাধা দিতে পারি না। তবে ধেনুকে একবার জিজ্ঞেস করি সে তোমার কাছে যাবে কি না।”

ধেনু অস্বীকার করলো যেতে। তখন বিশ্বামিত্র অনুচরদের আজ্ঞা দিলেন সবলে ধেনুকে নিয়ে যেতে। কিন্তু ধেনু নিতে গিয়ে মহাবিপদ হলো। ধেনু ক্রুদ্ধ হয়ে পুচ্ছ আন্দোলন করলো—দেখা দিল পল্লবসৈন্য, হাঙ্গারব করলো—দেখা দিল কস্মোজসৈন্য আর বিভিন্ন অঙ্গের থেকে নিষাদ, কিরাত, যবন, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি নানা বর্ণের নানা অস্ত্রধারী সৈন্য দেখা দিল। আক্রমণ করলো তারা একযোগে বিশ্বামিত্র ও তাঁর অনুচরদের। বাধ্য হলেন বিশ্বামিত্র ধেনু না নিয়েই পলায়ন করতে।

এবার এই উপাখ্যানটির গভীরে কি নিহিত আছে তাই বিশ্লেষণ করা দরকার।

পুরাণের উপাখ্যান ব্যাখ্যা করতে গেলে, একটি কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে এই—আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি ও ঋষিরা সবাই ছিলেন মহাকবি। তাই অতি সাধারণ কথাও তাঁরা লিখে গিয়েছেন কবিতায়। একথা বেদের মধ্যে প্রবেশ করলে তো অবশ্যই জানা যায়। পুরাণ প্রভৃতির মধ্যেও তাই। তাছাড়া আছে আবার রূপকের প্রয়োগ। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে যে সব নাম চলত—তা কোন মানুষ বা জন্তু বা কোন গণ বা কোন অঞ্চল কি প্রদেশ বা কোন পর্বত নদী, হ্রদ, সাগর ইত্যাদির—সে সব নামের নানা রকম অর্থ হয়। যিনি যত

বেশী বিদ্বান, তিনি সেই নামগুলির তঁত বেশী রকমের অর্থ করতে পারেন।

পৃথিবী কি কামধেনু ?

এখন ঐ কামধেনু নিয়ে মুনি বশিষ্ঠ ও ঋষি বিশ্বামিত্রের বিরোধের উপাখ্যানে কি রূপক প্রয়োগ করা হয়েছে—তাই একটু খুঁজে দেখা যাক।

বৈদিক সাহিত্যে গো শব্দের অর্থ হচ্ছে পৃথিবী। কিন্তু পৃথিবীকে কি কামধেনু বলা যায়? কেন যাবে না? এই পৃথিবীই তো সবার সব কামনা পূর্ণ করে। এই জগতে প্রত্যেকের প্রথম ও প্রধান কামনা কি?

সে কামনা হচ্ছে বেঁচে থাকার ও বড় হওয়ার। এই কামনা কার নেই? শ্রীওলা কি ঘাস থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সবারই আছে—এমন কি পাহাড়রাও বাড়ে। বাঁচতে হলে ও বাড়তে হলে সবারই দরকার অন্ন। সবাইকে সেই অন্ন যুগিয়ে দেয় এই পৃথিবী। আবার আজকে যে মানুষ ছুটেছে মহাকাশ জয় করতে তার জন্তে যা কিছু যন্ত্র দরকার সবই তৈরী হচ্ছে এই পৃথিবী থেকেই মালমসলা সংগ্রহ করে। এমন সর্বরত্নময়ী বসুন্ধরাকে, পুরাণের কবিরা যদি কামধেনু নাম দিয়ে থাকেন তাতে আর বেশী কি বলেছেন—বরং ঐ নাম দিয়ে পৃথিবীর পরিচয় তো একটি শব্দেই প্রকাশ করেছেন তাঁরা—এ তাঁদের গৌরবেরই কথা।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, বশিষ্ঠের কামধেনু হলো আসলে তাঁর চাষের জমি। এই ধারণা আরো দৃঢ় হয় যখন দেখা যায় বশিষ্ঠের সেই কামধেনুর নানা অঙ্গ থেকে নানা বর্ণের সৈন্য বের হয়ে এসে বিশ্বামিত্রকে বাঁধা দিচ্ছে। এরা কারা?

কামধেনু রূপকের ভেদ

ধেনুর পুচ্ছ থেকে বের হলো পহ্লবী সৈন্ত । প্রাচীন পারস্যের নাম ছিল পহ্লব । এই আমাদের কালেও পারস্যের সুলতান রেজা শাহ্ কিভাবে পহ্লবী উপাধি গ্রহণ করে অতীতের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন । পুচ্ছ শব্দটি থেকেও বোঝা যায় পশ্চাৎ বা পশ্চিম দিক । সেই পশ্চিমদিক থেকে এসেছিল অস্ত্রধারী পহ্লবীরা যখন তারা খবর পেল যে, বিশ্বামিত্র জমির অধিকার নিতে এসেছেন । বশিষ্ঠ যে ধেনুকে জিগ্যেস করেছিলেন ধেনু যাবে কিনা বিশ্বামিত্রের অধিকারে—তার থেকেই তো স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বশিষ্ঠ চাষী-সম্প্রদায়ের যত যত গণ সেই যুগে তাঁকে প্রধান বলে স্বীকার করত—তাদের সবার মতামত জানতে চেয়েছিলেন । পহ্লবীরা তো অথর্বার নাম স্মরণে রেখে তাদের পুরোহিতদের নাম দিয়েছিল অথর্বন্—এতই শ্রদ্ধা করত তারা অথর্বা বা বশিষ্ঠকে । তারা কেন সহ্য করবে বিশ্বামিত্রের প্রভুত্ব—যাঁর সঙ্গে তাদের কোন পরিচয়ই নেই । বেশ মনে হয় যে, সমস্ত চাষীগণের প্রধানরাই অথর্বার নিঃস্বার্থপরতায় মুগ্ধ হয়ে, তাঁকে বশীদিগের শ্রেষ্ঠ বলেই বশিষ্ঠ নামে ডাকত । সেই বশিষ্ঠের অধিকার যাতে বিশ্বামিত্রের গ্রাসে না যায় তার জন্তেই তারা ছুটে এল প্রতিরোধ করতে । অবশ্য পুরাণে এমন কোনই উল্লেখ নেই যে অথর্বাই বশিষ্ঠ ; কিন্তু তবু এ সন্দেহ জাগে । তার কারণ পরে আরো বলছি ।

বেদের সঙ্গে পুরাণাদির সম্বন্ধ

কিন্তু বেদের কথা বলতে গিয়ে পুরাণের কথায় আসছি কেন ? সে প্রশ্নের জবাবও দিই ।

পণ্ডিতজনেরা বলেন—বেদের মন্ত্রগুলি হচ্ছে বীজ ; ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদগুলি তার ক্রমবর্ধিত অঙ্কুর ; ষড়্‌দর্শন, স্মৃতি-

গুলি ও পুরাণগুলি তারি শাখা-প্রশাখা; মহাকাব্য ছুটি অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারত তার ফুল; আর তন্ত্রগুলি হচ্ছে তারি ফল—এই ফলের মধ্যেই আবার বীজের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই বেদকে সমগ্র করে বুঝতে হলে ঐ অংশগুলির কোনটিকেই বাদ দেওয়া চলে না।

বরুণ ও মিত্রের কাহিনী

কিন্তু মুনি ও ঋষির বিবাদেরও আগে—ঠিক তেমনি আর এক বিবাদ জেগেছিল বরুণের সঙ্গে ইন্দ্রের বা মিত্রের। তখন বরুণকে বলা হত অশুর। বিবাদের কারণ হচ্ছে গোধন বা পৃথিবী। ইন্দ্র বা মিত্র যুদ্ধ করে বরুণের কাছ থেকে তাঁর গোধন কেড়ে নেন—সেই মানবসভ্যতার প্রত্যুষে এক স্মরণাতীত যুগে। আবার ঐ বরুণ শব্দের অর্থ হচ্ছে—যা সব কিছুকেই আবৃত করে রাখে। বৃত্র শব্দেরও ঠিক সেই অর্থ। অথচ বরুণ শেষ পর্যন্ত দেবত্বলাভ করে মিত্রের সঙ্গে একাসনে বসতে পেলেন—তখন তাঁদের যুগ্ম নাম হল—মিত্রাবরুণ। বৈদিক সাহিত্যে মিত্র অর্থে দিন আর বরুণ অর্থে রাত্রিও বোঝায়। কিন্তু বেচারী বৃত্র—সে চিরদিন দৈত্যই থেকে গেল, ইন্দ্র তাকে বধ করে বৃত্রঘ্ন নামে পরিচিত হলেন।

এখানে একটি কথার উল্লেখ বোধ হয় অবাস্তব হবে না। কথাটি এই—পারস্য দেশের প্রাচীন অগ্নিপূজক পার্শীদের ধর্মগ্রন্থের নাম “জেন্দ্ আবস্তা”। তাতে দেখা যায় যে, দেবতা হচ্ছেন “অহুর মাজদা,” আর দেও বা দৈত্য হচ্ছে “বেত্রহন”। অহুর শব্দটি তো অশুর শব্দের রূপান্তর। তেমনি বেত্রহন হচ্ছে বৃত্রঘ্ন শব্দের ভিন্ন রূপ। তাহলে কি এইটিই সত্য যে, আদিতে পারস্যের আর ভারতের ধর্ম একই থাকলেও ইন্দ্র যখন অশুর বৃত্রকে মিথন করে ‘বৃত্রঘ্ন’ উপাধিলাভ করলেন, তখন থেকেই পার্শীদের ধর্ম একেবারে বিপরীত হয়ে গেল

হিন্দুদের ধর্ম থেকে? এ কথা মনে হবার আরো একটি কারণ। এই যে, প্রাচীন পার্শীদের অগ্নিরক্ষা করতেন যারা তাঁদের নাম ছিল অথর্বন। এই অথর্বনরাই ছিলেন প্রাচীন পারস্যের পুরোহিত-গোষ্ঠী। অথর্বন শব্দের সঙ্গে আমাদের দেশের অথর্বা শব্দটির মিল অত্যন্ত স্পষ্ট। এই অথর্বাই তো আমাদের দেশে অগ্নির উদ্ভাবন করেছিলেন।

অথর্বা ও বশিষ্ঠ

বেদে পাই—

“ত্বামগ্নে পুষ্করাদধি

অথর্বা নিরমন্তত

মূর্খো বিশ্বস্য বাষতঃ ॥” ঋ—৬।১৬।১৩

হে অগ্নি, পুষ্কর থেকে তোমায় মন্তন করেছিলেন অথর্বা। তিনিই বিশ্বের সমস্ত অগ্নিযাজকদের প্রধান—যেমন শরীরের প্রধান হচ্ছে মাথা।

কে জানে—ঐ মন্ত্রে যে পুষ্কর শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তা আমাদের অতি পরিচিত পুষ্করতীর্থেই নির্দেশ করছে কিনা।

আবার ঋগ্বেদে পাই—

ইমমু ত্যামথর্ববদ অগ্নিঃ মন্তন্তি বেধসঃ ॥”

ঋ—৬।১৫।১৭ ॥

এই অগ্নিকে বেদজ্ঞ ঋত্বিকগণ অথর্বার মত করে মন্তন করছেন। এর থেকেই তো জানা যাচ্ছে যে অথর্বা ছিলেন প্রথম অগ্নি-মন্তনকারী।

অথর্বাই প্রথম কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালাবার বিদ্যা, যাকে বলা হয় অরণিমন্তন বা অগ্নিমন্তন বিদ্যা, তারি উদ্ভাবন করেছিলেন।

এই অথর্বার সম্বন্ধে আরো জানা যায় যে, তিনি ছিলেন ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ-পুত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র বলেই তখনকার দিনের নিয়মানুযায়ী তিনি পিতার কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যালভের অধিকার পান। ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে আমরা পরে জানতে পারব। এখন অথর্বার কথাই বলি।

বেশ যেন সন্দেহ হয় যে, অথর্বাও যিনি, অথর্বানুও তিনি, আর বশিষ্ঠও তিনি। ব্রহ্মার মানসপুত্র হিসেবে সেই যে সপ্তঋষির নাম আমরা পাই, যথা—মরীচি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য ও ক্রতু—তার মধ্যে তো কই অথর্বার নাম নেই—যদিও বশিষ্ঠ নামটি আছে। অথচ বেদে তো অথর্বাকেই পিতা বলে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে—সেই সূত্রেই হয়তো ব্রহ্মাকে অথর্বার পিতা বলেই পিতামহ বলা হয়েছে পুরাণে।

অবশ্য এমনও হতে পারে যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে অথর্বা নিজেকে এমন সংযত করেছিলেন সবদিকে যে, আত্মবশীদেব শ্রেষ্ঠ বলে বশিষ্ঠ উপাধি লাভ করেন উত্তরকালে। বশী শব্দ থেকেই নিষ্পন্ন হয়েছে বশিষ্ঠ শব্দ—ঠিক যেভাবে গুরু শব্দ থেকে আসে গরিষ্ঠ। আর সেই উপাধি তাঁর বংশের সবাই পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ব্যবহার করতে থাকেন।

বশিষ্ঠ ও বরুণ

বশিষ্ঠ সম্বন্ধে আবার এ কাহিনীও পুরাণে পাওয়া যায় যে, তিনি মিত্রাবরুণ বা কেবলমাত্র বরুণের পুত্র। একটা কথা—ব্রহ্মাই যে বরুণ সে সন্দেহ করবারও কিন্তু প্রচুর অবকাশ আছে। সে কথা থাক—বিশ্বামিত্রের পরিচয় নেওয়া যাক।

বিশ্বামিত্র ও মিত্র

ঋচীক ঋষির যজ্ঞে যে চরু তৈরী হয়েছিল তা ভক্ষণ করার ফলে গাখি বা গাধি রাজার মহিষী বিশ্বামিত্রের জন্মদান করেন।

কিন্তু ঐ বিশ্বামিত্র নামটি থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে যে, কোন না কোন সূত্রে মিত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। যাই হোক, পূর্ব যুগে যেমন বরুণ ও মিত্রের বিরোধ ঘটেছিল গোধন নিয়ে, তেমনি বিবাদ আবার বাধলো সেই গোধন নিয়েই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে।

ধেহুর হান্সারবে জাগলো কন্বোজ সৈন্য। এরা এল সম্মুখ অর্থাৎ পূর্বদিক থেকে। এই কন্বোজ দেশ কোথায়? বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, কন্বোজ ছিল গান্ধারের উত্তরে বা উত্তর-পশ্চিমে। পুরাতত্ত্ববিদ্রা প্রমাণ করেছেন যে, বর্তমানকালের কান্দাহার—যা কাবুলের কাছে অবস্থিত, তারি নাম ছিল সেকালে গান্ধার। যদি কান্দাহারের উত্তরে বা উত্তর-পশ্চিমেই কন্বোজের নিশ্চিত স্থান হয় তাহলে মানতেই হয় যে, বশিষ্ঠের তপোবন ছিল তারও পশ্চিমে। কিন্তু তাতে আর বশিষ্ঠকে ভারতের মানুষ বলে দাবী করা যায় না। আরো এক কথা, বশিষ্ঠআশ্রম বলে যতগুলি স্থান আজও পর্যন্ত চিহ্নিত তীর্থ হয়ে আছে তার সবগুলিই এই ভারতের মধ্যে—তার একটির স্থান বর্তমান কাশ্মীরে আর একটির স্থান পঞ্জাবে। তারো পশ্চিমে আর কোন বশিষ্ঠআশ্রমের সন্ধান পাওয়া যায়নি এ পর্যন্ত। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বিরোধের ব্যাপারে বশিষ্ঠ যখন শতপুত্রকে হারালেন তখন যে নদীগুলিতে আত্মবিসর্জন করতে গিয়েছিলেন, সেই শতদ্রু, বিপাশা প্রভৃতি নদীগুলিও পঞ্জাবেই অবস্থিত।

কিন্তু পঞ্জাবের পূর্বদিকে অণ্ড কোথায় আছে কন্বোজ? তার উল্লেখ তো কই বেদজ্ঞরা করেন নি! তাঁরা না বললেও আমরা দেখছি যে, এখনো কন্বোজ নামে একটি দ্বীপ আছে ভারতের পূর্ব দিকে। পুরাণে কি তারই কথা বলা হয়েছে?

এই কন্বোজ দ্বীপ বা কন্বোডিয়ায় ভারতের বৌদ্ধধর্ম সমধিক প্রসার লাভ করেছিল।

মনে পড়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথের লেখা—

“স্থপতি মোদের স্থাপন করেছে

বরভূধরের ভিত্তি ।

শ্রাম কস্বোজ ওঙ্কারধাম

মোদেরি প্রাচীন কীর্তি ॥”

সুতরাং, অনুমান করা ভুল হবে না যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই কস্বোজের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ । সেই কথা আরো প্রমাণিত হয় আজো কস্বোজে অগস্ত্যের প্রস্তরমূর্তি বর্তমান আছে জেনে । এই তথ্য প্রকাশ করেছেন শ্রদ্ধেয় পুরাতত্ত্ববিদ ক্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় । তিনি সংগ্রহ করে এনেছেন সেই প্রস্তরমূর্তির একটি আলোকচিত্র । অগস্ত্য যে বশিষ্ঠের সম-সাময়িক কালের মানুষ তার খবর পুরাণেই পাই । আবার সেই যে উপাখ্যান আছে—অগস্ত্য গণ্ডুবে সমুদ্র পান করেছিলেন—কে জানে, তার মধ্যে হয়তো এই কথাই লুকানো আছে যে, তিনিই প্রথম দ্বীপাঞ্চলে নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন । যাই হোক, কুস্তজ নামেও অগস্ত্য পরিচিত ছিলেন । কস্বোজ শব্দটির সঙ্গে কুস্তজ শব্দটির বেশ যেন মিল আছে ।

পুরাণে একথাও আছে যে, বশিষ্ঠের অর্ণবযান ছিল । বাণিজ্যও করতেন তিনি । এদিক থেকেও অথর্বার সঙ্গে বশিষ্ঠের যথেষ্ট মিল । অথর্ববেদে পণ্যকাম অথর্বার একটি কাণ্ডিকা বা সূক্ত আছে । তার প্রথম মন্ত্র হচ্ছে—

ইন্দ্রমহং বণিজং চোদয়ামি

স ন ঐতু পুরএতা নো অন্ত ।

নুদগ্নরাতিং পরিপস্থিং মৃগং

স ঈশানো ধনদা অন্ত মহম্ ॥

অঃ ৩।১৫।১॥

—বণিক ইন্দ্রকে আমি চালিত করি। তিনি আশ্রম আমাদের কাছে, চলুন তিনি আমাদের আগে আগে। দূর করে দিন তিনি শত্রুদের, যারা দান করে না; দূর করে দিন পথের বাধা, বন্য পশুদের। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশান—তিনি আমাদের সবাইকে ধন দান করুন।

এই মন্ত্রটি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, অথর্বাও বাণিজ্য ভালই বুঝতেন। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের মুনিসূক্তে যা পাই তাও মনে রাখার মত। মুনিরা পূর্ব ও পশ্চিম দুই সমুদ্রে যাতায়াত করতেন। সমুদ্রে যেতে হলে, তখনকার দিনে পালতোলা মস্ত নৌকা বা জাহাজ নিয়েই যেতে হতো। তাই বায়ুর গতি ভাল করেই জানতে হতো মুনিদের। মুনিকে তাই কি বলা হয়েছে বায়ুর সখা? কিন্তু সে কথা থাক। ধেনুর কথা বলি।

অথর্বা ও বশিষ্ঠ

কথায় কথায় মনে পড়ে গেল—শ্রদ্ধেয় অর্ধেকুমার আমাদের জন্তে আরো একটি বিচিত্র তথ্য এনে দিয়েছেন। জাপানের অতি পুরাতন একটি হস্তলিখিত পুঁথি থেকে তিনি উদ্ধার করে এনেছেন দু'টি রেখাচিত্র। একটি হচ্ছে সস্ত্রীক বশিষ্ঠের, অপরটি সস্ত্রীক আংগিরসের। সে চিত্র দেখে স্বভাবতই মনে হয় যে, সেকালে জাপানের মানুষেরাও জানতেন বশিষ্ঠের সঙ্গে আংগিরসের যোগাযোগের কথা। আমাদের দেশে বেদাদি গ্রন্থে অথর্বার সঙ্গেই আংগিরসের ঘনিষ্ঠতার কথা আছে। সেকালে ঋষিরা অথর্বাকেও যেমন পিতা বলে উল্লেখ করতেন, তেমনি উল্লেখ করতেন আংগিরসকেও। আবার সমস্ত অথর্ব বেদখানাকেই তাঁরা বলতেন—“অথর্বাংগিরস”। কিন্তু জাপানে বশিষ্ঠের সঙ্গে আংগিরসের যোগ ঘটলো কি করে? তাইতো আবার মনে হয় যে, অথর্বারই উপাধি ছিল বশিষ্ঠ।

কামধেনু রূপকের ভেদ

এখন তো বেশ মনে হচ্ছে যে, সেই মুনি ও ঋষির বিরোধের দিনে পশ্চিম থেকে পহ্লবীরা আর পূর্ব থেকে কন্বোজীয়রা এসে গিয়েছিল বশিষ্ঠের সাহায্য করতে—শুধু এই কারণে যে, তখন নিশ্চয়ই পশ্চিমে পারশ্ব থেকে পূর্বে কন্বোজ পর্যন্ত দক্ষিণ সমুদ্রতীরের সমস্ত ভূভাগই ছিল কৃষিজীবীদেরই অধিকারে। তারা যদিও বাস করতো ভিন্ন ভিন্ন গণ হিসেবে, কিন্তু বশিষ্ঠকেই জানতো তাদের প্রধান বলে—পিতা বলে।

একথা তো বর্তমানকালে মনীষীরা জানেন যে, এই পূর্ব গোলাধের দক্ষিণ সমুদ্রতীরের অঞ্চলেই স্মরণাতীতকাল থেকে শস্য জন্মায় এবং সেই কাল থেকেই পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের মানুষ এখান থেকে শস্য পাবার আশা করে থাকতো। পরে অবশ্য পৃথিবীর পশ্চিম গোলাধ অর্থাৎ আমেরিকা আবিষ্কারে কৃষির জমি বেড়েছে এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে রাশিয়া প্রভৃতি উত্তর অঞ্চলেও শস্য ফলাবার নতুন জমি পাওয়া গিয়েছে। তাহলেও পূর্ব গোলাধের এই দক্ষিণ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের কৃপায় শস্য ফলানো যত সহজ, উত্তরাঞ্চলে তত সহজ নয়। সেই পুরাকালের কৃষিজীবীরা তাই দলবেঁধে গ্রাম বা গণ তৈরী করে বাস করতো দক্ষিণ অঞ্চলেই—আর সবাই তারা বশিষ্ঠকে তাদের সর্বসম্মানিত প্রধান বলে মানতো। খুবই সম্ভব যে, পঞ্জাবের যে অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, সেখানেই ছিল বশিষ্ঠের আদি আবাস বা আশ্রম বা তপোবন।

সিন্ধু-হিন্দু-ইণ্ডো-শিন্টো

ঐ সিন্ধু শব্দটি তো যত পশ্চিমে গিয়েছে ততো হয়েছে তার উচ্চারণ বদল—পারশ্বে হলো হিন্দু আর তারও পশ্চিমে হয়ে

গেল ইণ্ডো। পূর্বেও কি ঐ সিদ্ধ শব্দটি প্রচারিত হয়েছিল? এর উত্তরে মনে আসে—চীনদেশে সব থেকে যে প্রাচীন ধর্ম ছিল তার নাম শিন্-তু। জাপানেও প্রাচীনতম ধর্মের নাম শিণ্টো। সব থেকে আশ্চর্যের কথা—সিদ্ধ শব্দটির সঙ্গে শুধু যে ঐ শিন্-তু বা শিণ্টো শব্দের মিল আছে তাই নয়, সিদ্ধ সভ্যতা সম্বন্ধে যারা বিচার-বিবেচনা করেছেন, তাঁরা বলেন যে, তখন নাকি শৈব ধর্মই প্রবল ছিল—আর শৈব ধর্মের সঙ্গে শিন্-তু বা শিণ্টো ধর্মের অদ্ভুত রকমের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

কামধেনু—চাষের জমি

এবার বলি—বশিষ্ঠের সেই কামধেনুর বিভিন্ন অংশ থেকে আর যে সব সৈন্য বের হয়েছিল—সেই যবন, নিষাদ, কিরাত, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতিদের কথা। পারস্য থেকে কহোজ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যেই যে ঐসব জাতি বা গণের বাস ছিল, তাও আজকে আর ঐতিহাসিকদের অজানা নয়। তাই কামধেনু বলতে যে বশিষ্ঠের চাষের জমিকেই বোঝায়, এ কথা বেশ মনে হয়।

এখন দেখা যাক—অস্ত্রধারী শিকারী বিশ্বামিত্র কেন হঠাৎ বশিষ্ঠের কাছে চাষের জমি চেয়ে বসলেন?

শিকারীদের জীবিকা অত্যন্ত অনিশ্চয়ের। শিকারে গেলেই যে খাত্ত সংগ্রহ করা যাবে তার কোনই স্থিরতা নেই। আবার খাত্ত যদি পাওয়াও যায় অর্থাৎ যদি কোন জন্তু মারা পড়ে শিকারীদের হাতে—তার মাংস বেশীদিন ধরে সঞ্চয় করে রাখা যায় না। ছুঁচা-দিনের মধ্যেই সঞ্চিত মাংস অখাত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কৃষকের জীবিকা তেমন অনিশ্চিত নয়। শস্যের মস্ত সুবিধা এই যে, তা বহুকাল পর্যন্ত সঞ্চয় করে রাখা যায় এবং প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যায়।

বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য লাভ

বিশ্বামিত্র তো সদলবলে শিকার করতে বেরিয়ে ভাল করেই জেনেছিলেন যে, তাঁর জীবিকা কত অনিশ্চিত ও কষ্টকর। সারাদিন ঘুরেও কোন খাত সংগ্রহ করতে না পেরেই তো তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল কুবরু বশিষ্ঠের তপোবনে। সেখানেই তিনি শেষ পর্যন্ত জানতে পেলেন যে, কৃষিকর্ম কত সুনিশ্চিত জীবিকা। কাজেই জমির অধিকার পেতে চাইলেন। কিন্তু ফল হলো বিপুল গণ-আন্দোলন ও বিশ্বামিত্রের পরাজয়। পুরাণে বর্ণিত বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধের মধ্যে এই কথাটিই রূপকে ধরা আছে মনে হয়।

অবশ্য ঐ দুই প্রধানের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটি মিলনও হয়েছিল—ঠিক যেমন সন্ধি হয়েছিলো আরো পূর্বযুগে মিত্রাবরুণের। এবার বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মিলন কিভাবে হলো তাই বলি।

পরাজিত হয়ে বিশ্বামিত্র কামধেনু ত্যাগ করে গেলেন বটে—কিন্তু বশিষ্ঠকে প্রতিশোধ দিতে ছাড়লেন না। পুরাণে তাই দেখি—একে একে বশিষ্ঠের একশোটি ছেলেকে বিশ্বামিত্র সংহার করবার পথ ধরলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তার জন্তু বিশ্বামিত্রকে আক্রমণ না করে পুত্রশোক কাতর হয়ে নিজেরই জীবন বিসর্জন দেবার সংকল্প করলেন। নানা নদীতে নানাভাবে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, কিন্তু মৃত্যু হলো না। তাঁর। তাই আবার তপোবনে ফিরে তপস্বীতেই মন দিলেন। কৃষিই সেই তপস্বী।

ওদিকে বিশ্বামিত্র বেশ বুঝলেন যে, বশিষ্ঠকেই মেরে ফেলতে না পারলে তিনি তাঁর কামনা মেটাতে পারবেন না। ঠিক করলেন তাই বশিষ্ঠ-নিধন যজ্ঞ করবার। সেই যজ্ঞে পুরোহিত হবার জন্তে বশিষ্ঠকেই নিমন্ত্রণ করলেন। সেকালে অভিচার মন্ত্র প্রয়োগ করে মারণ, উচাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়া করা যেতো শত্রুর ওপরে। অথর্ব বেদে তার অনেক মন্ত্র পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ ছিলেন

সেই মন্ত্রে পারদর্শী। বিশ্বামিত্র তাই বশিষ্ঠকেই বরণ করলেন পোরোহিত্য করবার জন্তে।

এ কথা তো ভাবতেই পারা যায় না যে, নিজের মৃত্যুকে কেউ নিজেই মন্ত্র পড়ে ডেকে নিয়ে আসবে। কিন্তু বশিষ্ঠের পক্ষে তাও সম্ভব—তিনি সব জেনে শুনেই রাজী হলেন নিজের নিধন যজ্ঞে পোরোহিত্য করতে। কারণ তিনি যে নিজেকে বশ করতে পেরেছিলেন—আত্মবশীদের অগ্রগণ্য বলেই তো তাঁর নাম বশিষ্ঠ। তাঁর সঙ্গে বোধ হয় একমাত্র তুলনা গ্রীসদেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সক্রেটিসের করা যায়। সেই সক্রেটিস জেনে শুনেই পান করেছিলেন হেমলক বিষ।

নিধন যজ্ঞ শুরু হলো। শেষ বা পূর্ণ আছতি দেবার জন্তে বশিষ্ঠ তাঁর আসনের উপর উঠে দাঁড়ালেন—মন্ত্র পাঠ শেষ হলেই বশিষ্ঠের মুণ্ড খসে পড়বে সম্মুখের যজ্ঞকুণ্ডে। মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করলেন বশিষ্ঠ, কিন্তু বিশ্বামিত্র আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন তিনি বশিষ্ঠকে—বললেন—“না, না, তোমার মত মানুষকে বধ করে আমি ব্রাহ্মণ হতে চাই না। দিও না তুমি পূর্ণাছতি, পণ্ড হোক যজ্ঞ।”

বশিষ্ঠও ধরলেন তাকে জড়িয়ে; সম্মেহে বললেন—“এতোদিনে তোমার তিতিক্ষা জেগেছে—এখন তুমি সত্যই ব্রাহ্মণ।”

সেই তিতিক্ষা বা ক্রমাই হচ্ছে ব্রাহ্মণের প্রধান সম্বল। যাই হোক, বশিষ্ঠ যখন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নিলেন তখন অত্যাশ্চর্য্য সবাই তাতে সায় দিল। এতোই ছিল বশিষ্ঠের ওপর সবায়ের শ্রদ্ধা—সবাই জানতো বশিষ্ঠ কখনো কোন অত্যাচার করতে পারেন না। এই কাহিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে এই সত্যই রয়েছে যে, বিশ্বামিত্র কিভাবে নিভ্য তপস্যায় ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করেন তারি পরিচয় দিলেন এক সভা ডেকে—আর সভাপতি হন বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠের মাথা ঠেঁট হয়ে গেল বিশ্বামিত্রের মুখে ব্রহ্মবিদ্যার

কথা শুনে, যদিও বশিষ্ঠ কোনদিনই বিশ্বামিত্রকে সে বিড়া শেখাননি।
শেষে বার্থ্য হলেন বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বা কুষক বলে স্বীকার
করতে।

মুনি ও ঋষিদের সমন্বয়

সেই থেকে সমন্বয় শুরু হলো মুনি ও ঋষিদের। শেষ হলো
সত্যযুগের কাহিনী।

কিন্তু সেই সমন্বয়ের ফলে কি অবস্থার সৃষ্টি হলো সে কথা
না জানলে বোঝা যাবে না, কেন মুনিরা ঋষিদের মন্ত্র সংকলন করে
বেদের প্রচার করেছিলেন। এখন তাই আমাদের জানতে হবে
মুনি-ঋষিদের সমন্বয়ের যা ফল হয়েছিল। তার পরিচয় জানতে পাব
ত্রেতাযুগের বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করলে। মুনি ও ঋষির সমন্বয়ের ফলেই
ত্রেতাযুগে রামরাজ্য জেগে উঠেছিল কি ভাবে—এবার তার কথাই
জানতে পাব। কিন্তু তার আগে বিশ্বামিত্রের কথা আরো একটু
বলি।

ঋগ্বেদের মধ্যে একটি মন্ত্র পাই—

অমিত্রায়ুধো মরুতামিব প্রয়াঃ

প্রথমজা ব্রহ্মণ্যে বিশ্বমিদ্বিহুঃ।

দ্যুম্বদব্রহ্ম কুশিকাস এরির

এক একো দমে অগ্নিঃ সমীধিরে ॥ ঋ—৩।২৯।১৫॥

—শত্রুর সঙ্গে যঁারা বায়ুর মত বলে অন্নের জন্ত যুদ্ধ করেন,
ব্রহ্ম বা মন্ত্র থেকেই যঁারা প্রথম জন্মেছেন, যঁারা বিশ্বের সব কিছুকেই
নিশ্চিতরূপে জানেন, তাঁরাই হচ্ছেন কুশিক গোত্রের ঋষি। তাঁরা
প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে অগ্নি জ্বেলে অভিনাষ পূর্ণ করার
জন্তে অগ্নির উদ্দেশে হবি দান করেন মন্ত্র পাঠ করে।

এই কুশিক গোত্রেই বিশ্বামিত্রের জন্ম, তাই তাঁর আর এক

নাম কৌশিক। কুশিক বা কৌশিক শব্দের অর্থ করেছেন আচার্য যাস্ক—যে উচ্চস্বরে কথা বলে। যাঁরাই স্তবস্তোত্র মন্ত্রাদি পাঠ করেন তাঁরা স্বভাবতই বেশ জোরে জোরে কথা বলেন। আর একটি কথা—ঐ মন্ত্রে পাচ্ছি কুশিকরা মন্ত্র থেকেই জন্মেছেন। একটু ভেবে দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে, ও কথাটি একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে কবিত্ব করে। আসলে মন্ত্রই জন্মেছে ঋষিদের মুখ থেকে। আজও তাই ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা নামে খ্যাত।

দ্বিজমাত্রেই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের প্রত্যেকেই জানেন যে, বিশ্বামিত্রই গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি। এই মন্ত্র তিনি লাভ করেছিলেন কঠোর তপস্যাবলে। কিন্তু লাভ করার পরে তিনি তা সবাইকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এক কথায় বিচার দ্বার তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন ঐ তিন বর্ণের সবায়ের সামনে। এ তাঁর অক্ষয়কীর্তি।

মন্ত্রগুপ্তি—ব্রহ্মবিদ্যা-কৃষিবিদ্যা

তখনকার দিনে বিদ্যা অর্থে কেবল ব্রহ্মবিদ্যাই বোঝাতো। সেই বিদ্যা পিতার কাছ থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ছাড়া আর কেউ পেতেন না। এ কথার উল্লেখ আমাদের শাস্ত্রেই আছে। পিতার অন্যান্য পুত্রও জানতে পেতেন না কি সেই বিদ্যা। কেন তখন এমন কঠিন নিয়ম ছিল?

এ প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু জানতে পাই যে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্য নাম ছিল রহস্যবিদ্যা বা গুপ্তবিদ্যা। আচার্য যাস্কের প্রণীত নিরুক্ত বইখানির নিষট্ণু অংশে দেখছি—ব্রহ্ম হচ্ছে অমেরই একটি নাম। তাহলে কি ব্রহ্মবিদ্যার অর্থ ছিল সেই যুগে অন্তবিদ্যা বা কৃষিবিদ্যা? একথা আমরা জানি যে, তখনকার দিনে পিতার সমস্ত সম্পত্তির—চাষের জমিরও অধিকার ছিল কেবল জ্যেষ্ঠপুত্রের। ক্রমে সেই

অধিকার বলেই রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রই পেতেন রাজ্যের সিংহাসন। তাহলে কি এই সত্য যে, পিতা যাকে জমির অধিকার দিতেন, তাকেই কেবল গোপনে শিখিয়ে দিতেন জমি চাষের বা কিছু কৌশল? এ সন্দেহ আরো এই কারণে জাগে যে, বিশ্বামিত্র জমির অধিকার চেয়েই মুশকিলে পড়েছিলেন।

সেই ব্রহ্মবিদ্যা কিভাবে ক্রমশঃ কর্মগত কৃষিবিদ্যা থেকে ভাবগত শাণ্ডিল্যবিদ্যা হয়ে উঠেছিল সে কথা পরে জানা যাবে। এখন ঐ মন্ত্রগুপ্তি বা কৌশল গোপন করার কথাই বলি।

বর্তমান কালেও দেখতে পাই—যিনি কোন একটি বিশেষ কাজকে তাঁর জীবিকার একমাত্র নির্ভর বলে মনে করেন, তিনিও চান না সেই কাজের কৌশলটি নিজের পুত্র ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রকাশ করতে। এর কারণ মনে হয় এই যে, তিনি ভাবেন সবাই যদি তাঁর কৌশলটি শিখে ফেলে তাহলে বাজারে তাঁর কাজের কদর কমে যাবে, তাঁর আর একচেটিয়া ব্যবসা চলবে না। মনে হয়, ঠিক এই কারণেই পূর্বযুগে এক গোষ্ঠীর মানুষ অন্য গোষ্ঠীর মানুষকে তাঁদের জীবিকার মূল কৌশলটি শেখাতেন না। কিন্তু কোন কাজের কৌশল গোপন করে রাখলে কিভাবে সেই কাজও ক্রমে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়, তাও আমরা জানি। এমনি করেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে আমাদের দেশের বহু নিপুণ শিল্পীর বহু দক্ষ কাজ।

শুধু আমাদের দেশের নয়, দেশ-বিদেশেও এই মন্ত্রগুপ্তির পদ্ধতি দেখা যায়। বিভিন্ন উন্নত দেশের কারখানায়, যেখানে বিশেষ কৌশলে কোন মূল্যবান দ্রব্য তৈরি হয়, সেখানে অন্য দেশের লোক দূরে থাক, সেই দেশের সবাইকেও ঢুকতে দেওয়া হয় না—পাছে সবাই জেনে ফেলে সেই বিশেষ কৌশলটি। প্রত্যেক মানুষের মনোগত ইচ্ছা যে, সে যেন সবাইয়ের থেকে বেশী উঁচু হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তা কি কৌশল বা বিদ্যা গোপন করে রাখলেই সম্ভব হয়? তা কখনোই হয় না। যুগে যুগে আসেন বিশ্বামিত্র,

বশিষ্ঠের সাহায্য না পেয়েও তিনি আপন নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও তপস্কার বলে লাভ করেন রহস্যবিদ্যা, হয়ে ওঠেন ব্রাহ্মণ। তখন বশিষ্ঠও আর তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে অর্থাৎ সমকক্ষ বলে না মেনে পারেন না। কিন্তু সেই তপস্কার পথ অত্যন্ত দুর্গম। সে যে কত দুর্গম তার কথা জানতে পারি, যদি বিশ্বামিত্রের জীবন-কথা আরও আলোচনা করি।

সাধারণতঃ সবাই বলেন যে—সাধনা করলেই সিদ্ধিলাভ হয়, বিদ্যালাভ হয়। কথাটা অবশ্যই মিথ্যে নয়—তার জাজ্জল্যমান আদর্শ ওই বিশ্বামিত্র। কিন্তু তেমন শক্তিদ্বর মানুষ ক'জন আছেন জগতে? আমরা সবাই তো ভয় পাই একক তপস্কার, বাধ্য হই তাই গুরুর কাছে গিয়ে তপস্কার কৌশল জেনে নিতে। সেই কৌশলটুকু জানতে পারলে তবেই তো পারি তপস্কা বা সাধনায় অগ্রসর হতে।

ধন্য বিশ্বামিত্র! তিনি সেই বিদ্যালাভের মূল মন্ত্রটি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন তিন বর্ষের মানুষের কাছে। আর গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন বশিষ্ঠকেই।

কিন্তু বিশ্বামিত্র কি সত্যই কৃষিবিদ্যা লাভ করার জন্তে তপস্কা করেছিলেন? এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করি।

বিশ্বামিত্রের মন্ত্রলাভ

বশিষ্ঠের সঙ্গে বিরোধ করে বিশ্বামিত্র ভালই বুঝেছিলেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত্ব করে বশিষ্ঠের সমকক্ষ হয়ে উঠতে না পারলে কৃষিজীবীদের ওপর প্রভুত্ব করবার কোন পথই তিনি পাবেন না। অথচ বশিষ্ঠও রাজী নন তাঁকে ব্রহ্মবিদ্যা শেখাতে। শুরু হলো বিশ্বামিত্রের প্রাণান্তকর তপস্কা। জলে ভিজ়ে, রোদে পুড়ে, শীতে কেঁপে তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন কৃষিজীবীদের কাজকর্ম, বাধাও পেলেন তিনি বহু। ইন্দ্র পাঠিয়ে দিলেন অঙ্গরা মেনকাকে

বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে। বিচলিত হলেন বিশ্বামিত্র। কিন্তু আবার পণ করে লাগলেন তপস্যায়। খুঁজে পেলেন তিনি সীতাসূক্ত। এই সূক্তটি পাই অথর্ববেদের তৃতীয় কাণ্ডের সপ্তদশ কাণ্ডিকায়। তার একটি মন্ত্র হচ্ছে—

যুনক্ত সীরা বি যুগা তনোত
কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্ ॥
বিরাজঃ শ্লুষ্টিঃ সত্তরা অসন্ন
নেদীয় ইৎ সৃণ্যঃ পকুমা যবন্ ॥

—লাঙল ঘোড়, জোয়াল দাও, বিস্তৃত করে জমি তৈরি করে বীজ বুনে দাও। ভরে উঠুক খোলোয় খোলোয় ফসল, যা আমাদের বিরাজ বা অন্ন। এমন ফলন ফলুক যে যখন ফসল পেকে উঠবে, তখন যেন ঘন করেই কাস্তে চালাতে হয়।

শিকারী বিশ্বামিত্রের মুখে এই চাষের মন্ত্র কি করে উচ্চারিত হলো তার কথা ভাবলেই জানতে পারি, কত তপস্যায় তিনি এ মন্ত্রটি লাভ করেছেন।

এ মন্ত্রের দেবতা হচ্ছেন সীতা। সীতা শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে লাঙল-পদ্ধতি অর্থাৎ সাদা কথায় চাষ সংক্রান্ত যা কিছু ব্যাপার তাকেই বলে সীতা।

এখন কি আমরা বলতে পারি না যে, শস্য উৎপাদনের যা কিছু কাজ বিশ্বামিত্র অত্যন্ত বিচক্ষণভাবেই দেখে এই মন্ত্রটি লাভ করেছিলেন? কৃষির প্রতি তাঁর কতখানি আগ্রহ ছিল, তারও প্রমাণ এই সীতাসূক্ত। এর থেকে আরো বোঝা যায় যে, বর্শিষ্ঠ যদিও বিশ্বামিত্রকে কৃষির কৌশল শেখান নি, তবু বিশ্বামিত্র নিরস্ত হন নি। নিজের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে সম্পূর্ণভাবেই জেনে ফেলেছিলেন কৃষির কৌশল। তখন আর বর্শিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ঠেকাবেন কি করে? অবশ্য পুরাণের উপাখ্যানে বা অন্য কোথাও ব্রহ্মবিড়াই যে কৃষিবিজ্ঞা তা প্রত্যক্ষভাবে বলা নেই।

আমাদের শাস্ত্রে সবই তো বলা হয়েছে পরোক্ষভাবে। এ সম্পর্কে একটি বচনও আছে যে—দেবতার। পরোক্ষ প্রিয়। দেবতা বলতে যে বিদ্বান বোঝায় তাও আমরা আগে থেকেই জেনেছি। আজকের দিনেও তো দেখা যায়, বিদ্বান বা শিক্ষিত মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন তা কত শুদ্ধ ও সমৃদ্ধ, তাতে থাকে নানা অলংকার, উপমা ইত্যাদি যা অশিক্ষিতজন বুঝতেই পারেন না।



হ্রৈতা যুগ

মুনি ও ঋষির সমন্বয়ের ফল

এখন বলি মুনি ও ঋষির সমন্বয়ের ফলে কি পরিবর্তন দেখা দিল সমাজে ।

যতদিন বশিষ্ঠ ছিলেন জনগণের প্রধান বা কুলপতি, ততদিন বিভিন্ন গণের সবাইকেই তিনি স্বাধীনভাবে থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন । সবাই আসতো ব্রহ্মবিদ বশিষ্ঠের কাছে পরামর্শ নিতে । নানা সমস্কার ও বিধান-সমাধান করে দিতেন বশিষ্ঠ । কিন্তু তিনি সবাইকে ব্যক্তিগত উন্নতির পথই দেখাতেন । কৃষির কাজ যাঁরাই করেন তাঁরা প্রত্যেকে বীজের স্বতন্ত্র স্বভাব লক্ষ্য করে ক্রমশঃ ব্যক্তিবাদী হয়ে যান । আমাদের কালেও মেণ্ডেল সাহেব গাছ নিয়ে পরীক্ষা করে বংশগত স্বভাব সম্বন্ধে একটি মত প্রতিষ্ঠা করেছেন ।

বিশ্বামিত্র সেই ব্যক্তিগত উন্নতির মত থেকে সরে এসে স্থাপন করলেন বিশ্বগত উন্নতির মত বা বিশ্ববাদ । যাঁরা শিকার করে বেড়ান তাঁরা দেখতে পান যে, দলবেঁধে শিকার করতে না গেলে দলবদ্ধ পশুদের সামনে যাওয়া যায় না । আরো জানেন তাঁরা যে, যারা শিকারী হতে চায় তারা যদি সমান দক্ষ না হয়, তাহলে তার ফল হয় অনিষ্টকর । তাই বিশ্বামিত্র ব্যক্তিবাদী গণতন্ত্রকে বদলে বিশ্ববাদী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন ।

সেই রাজতন্ত্র বা রাষ্ট্র তৈরি হয়ে উঠলো ঋষিগোষ্ঠীর বিশেষ ক্ষমতা বাক্শক্তির ওপরে নির্ভর করেই। এই বাক্শক্তির প্রভাব কতখানি তার পরিচয় পাই আমরা ঋগ্বেদের দেবীস্মৃতিতে। সেই স্মৃতির ঋষি হচ্ছেন অম্বুনের কথা বাক্। তার একটি মন্ত্র হচ্ছে—

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং
চিকিতুবী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্॥

ঋ—১০।১২৫।৫॥

—আমিই রাজ্যের অধিশ্বরী, আমিই এনে দিই সবায়ের কাছে ধনরত্ন, সমস্ত জ্ঞান আমারই অধিকারে, যজ্ঞের কাজে আমিই হচ্ছি প্রথম।

বাস্তবিকই দেখা যায়, এখনো পর্যন্ত রাজ্য পালন করতে, ধন লাভ করতে, জ্ঞান লাভ করতে বা সবাইকে একত্রিত করে যজ্ঞ করতে প্রথম ও প্রধান সহায় হচ্ছে আমাদের বাক্শক্তি। এই সহায় বলেই ত্রেতা যুগে সম্ভব হলো সূর্যবংশের অভ্যুদয়। তাঁরা ছিলেন শিকারী গোষ্ঠীর মানুষ বিশ্বামিত্রের স্বজন। সমস্ত গণের ওপরে তাঁরা রাজত্ব করবার অধিকার পেলেন। তাঁরা বললেন—“আমরা অস্ত্রধারী, আমরা তোমাদের রক্ষা করব। তোমাদের যা কিছু ক্ষত তার থেকে ত্রাণ করব, তাই আমাদের নাম ক্ষত্রিয়। তার পরিবর্তে তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্যের চার ভাগের এক ভাগ জমা দেবে আমাদের রাজকোষে। সে রাজকোষ থেকে কেবল আমরাই ভোগ করব না, তোমাদেরও দেব প্রয়োজনমত।”

ধীরে ধীরে দেখা দিল রাজনীতি—দেখা দিল সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের প্রথা।

সূর্যবংশ

এখন সূর্যবংশের কথা একটু বলি। তাঁরা বলতেন যে, তাঁরা জন্মেছেন সূর্য থেকে। জাপানের রাজবংশ তো এখনো বলেন যে,

তাদের প্রথম জন্ম হয়েছে সূর্য থেকে। যাই হোক, ওই সূর্যবংশের সবাই কিন্তু বিশেষ করে সৌর মাস গণনা করতেন।

সৌর মাস ও চান্দ্র মাস

আমাদের দেশে আজও যে পঞ্জিকা ব্যবহার করা হয় তাতে সৌর মাস ও চান্দ্র মাসের পৃথক গণনা চলে আসছে। সৌর মাস গণনা হয় সূর্যের সঙ্গে বিভিন্ন রাশির সম্বন্ধ বিচার করে। আর চান্দ্র মাস গণনা করা হয় চন্দ্রের নক্ষত্রযুক্ত তিথি গণনা করে। অথচ মজা এই যে, আমাদের দেশে যত দেব-দেবীর পূজা সবই হয় চান্দ্র মাস অনুসারে। কেবল বিশ্বকর্মা, কার্তিক ও চড়ক পূজা হয় সৌর মাস অনুসারে।

বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও রাম

সূর্যবংশের রাজত্বকালে বশিষ্ঠ কি গতি লাভ করলেন? রামায়ণে দেখি সূর্যবংশের গুরুগিরি করছেন বশিষ্ঠ। বেশ মনে হয় যে, বশিষ্ঠ যখন বিশ্বামিত্রকে সমকক্ষ বলে স্বীকার করলেন তখন বিশ্বামিত্রও তাঁকে গুরুর পদে বসিয়ে দিলেন।

এ কথা তো সত্যি যে, জীবন ধারণ করার প্রথম উপায় যে আহার্য তা কৃষিকার্যের দ্বারা কত নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায়, তার সন্ধান বিশ্বামিত্র পেয়েছিলেন ওই বশিষ্ঠের কাছেই। সেদিক থেকে তো বশিষ্ঠ সত্যিই আদিগুরু সমস্ত মানবসভ্যতার। যতদিন কৃষির উদ্ভব হয়নি, অন্নের সংস্থান ঘটেনি, ততদিন তো মানুষ অন্নের চেষ্টাতেই উন্মাদ হয়ে বেড়াতো। বসবার সময় না পেলে কে আর সভ্যতার কথা ভাবতে পারে? আর বসতে পায় মানুষ তখনই যখন তার অন্নচিন্তা থাকে না। বশিষ্ঠই ছিলেন সেই অন্নসংস্থানের প্রথম পথিকৃৎ। বিশ্বামিত্র তাই তাঁর যোগ্য সম্মানই তো দিলেন।

কিন্তু আর একদিক থেকে ক্ষতিই হয়ে গেল বশিষ্ঠের। রাজার গুরুগিরি করতে গিয়ে সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে আর তাঁর তেমন যোগাযোগ রইলো না। সে কথার আলোচনা করব আমরা দ্বাপর যুগের কাহিনী বলার সময়। এখন, ত্রেতা যুগের কথাই বলি।

ত্রেতা যুগের আদর্শ পুরুষ হচ্ছেন রামচন্দ্র। আজ রামরাজ্য আমাদের দেশে পরম সুখের রাজত্ব বলেই বিখ্যাত। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীও সেই রাম-রাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন। দেখা যাক, কি ছিল সেই রাজত্বের বিশেষত্ব—কি বা সেই রাজা রামের মহত্ব।

রামচন্দ্রকে দেখি বাল্যে শিক্ষা দিচ্ছেন বশিষ্ঠ। আর তাঁর কৈশোরে শিক্ষা দিচ্ছেন বিশ্বামিত্র। রামের চরিত্রে তাই মুনিপন্থীর প্রভাব যতখানি, ঋষিপন্থীর প্রভাবও ঠিক ততখানি।

রামচন্দ্রের আর তিন ভাই—ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নও বাল্যে বশিষ্ঠের কাছেই শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু তাদের মধ্যে এক লক্ষ্মণ ছাড়া আর কেউ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পান নি বলেই জানা যায়।

বশিষ্ঠের কাছে শিক্ষা পেয়ে রাম হয়ে উঠলেন তিতিক্ষা বা ক্ষমার অবতার। আর বিশ্বামিত্রের কাছে শিক্ষা পেয়ে তিনি হয়ে উঠলেন সমদর্শী। বিশ্বামিত্রের শিক্ষাই রামের জীবনকে আমূল বদলে দিল—কি ভাবে তারি কথা বলি এবার।

রামায়ণের এ কাহিনী তো সকলেই জানেন যে, রামের যখন পনের বছর বয়েস, তখন বিশ্বামিত্র তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁর যজ্ঞ-রক্ষা করার জন্তে। সেখানে গিয়ে বিশ্বামিত্রের কাছে মন্ত্র পেয়ে রাম তাড়াকাকে বধ করলেন। ক্রমে অহল্যা উদ্ধার করলেন আর জনকের সভায় গিয়ে ভজ্ঞ করলেন হরধনু—বিশ্বামিত্রেরই আজ্ঞায়। শেষ পর্যন্ত রামের সঙ্গে সীতার এবং রামের অশ্ব তিন ভাইয়ের সঙ্গে সীতার অশ্ব তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেল। এই

হলো মূল কাহিনীর শুরু ; রামায়ণে অবশ্য এ কাহিনী আরো ফলাও করে বলা হয়েছে ।

রাম ও কৃষি

এখন উপাখ্যানটির মর্ম কি—তাই একটু খুঁজে দেখা যাক ।

কৃষির তত্ত্ব ঋষি বিশ্বামিত্র যে বেশ ভাল করেই বুঝেছিলেন তার পরিচয় আমরা পেয়েছি । আর সেই কারণেই ত্রেতাযুগের শুরু থেকেই তিনি মুনি বশিষ্ঠের অনুকরণে তপোবনে বাস করতে লাগলেন—অর্থাৎ সাদা কথায় চাষ-বাসে মন দিলেন । তবে একা নয়, আরো নানা ঋষিকেও সঙ্গে নিলেন । কিন্তু অগ্নি ঋষিরা ভারি মুশকিলে পড়লেন । তাঁরা তো আর নিজ নিজ তপস্তার বলে চাষকে জীবনের মূলকর্ম বলে বুঝে নিতে পারেন নি । সবাই জড় হয়েছিলেন বিশ্বামিত্রের আস্থানে । চিরকাল তাঁরা শিকার করতে অভ্যস্ত, সেই ছিল তাঁদের জীবিকা । বিশ্বামিত্র হঠাৎ দিলেন তাঁদের সবাইকে জীবিকা পরিবর্তন করবার পরামর্শ—সে কি সোজা কথা ! চিরকাল যিনি শিকারকেই নির্ভর করে বেঁচে আছেন, তিনি কেমন করে এক কথায় চাষ করার ওপর নির্ভর করেন ! তাঁদের মনে জাগলো তাই নানা ভয়, নানা আশঙ্কা । এই আশঙ্কা সেকালেও যেমন সত্য ছিল, আজকের দিনেও তেমনি সত্য । কেউই চান না তাই সহজে জীবিকা পরিবর্তন করতে । মানুষের এই স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশের পূর্বাচার্যরা বংশগত কর্মের বা জীবিকার বিধান দিয়েছিলেন । কিন্তু সে আবার অগ্নি কথা । এখন ঋষিদের কথাই বলি ।

ঋষি ও রাক্ষস

চাষের কাজ করতে গিয়ে ঋষিরা দেখলেন—এ তাঁদের পক্ষে একেবারে নতুন ধরনের কাজ । এ কথাও তাঁরা বুঝতে পারলেন না

যে, এই কাজে তাঁরা সফল হবেন কিনা। বিষম সমস্যায় পড়ে গেলেন তাঁরা বিশ্বামিত্রের উপদেশ মানতে এসে। সেই মহা সমস্তাই বা জীবিকা-পরিবর্তনের বিভীষিকাই তাঁদের সামনে তাড়কার মূর্তি নিয়ে হাজির হলো। তাইতো হয়—ভয় পেলে মানুষ তো সবখানেই ভূত দেখে। তাড়কাও সেই ভয় ছাড়া আর কিছু নয়।

ঋষিদের সেই ভয়কে আরো বাড়িয়ে দিলেন মুনিতান্ত্রিক কৃষি-জীবীরা। মুনি বশিষ্ঠ রাজার গুরু হয়ে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু অগ্ন সাধারণ মুনিরা মোটেই খুশী হতে পারেন নি ঋষিরা উড়ে এসে জুড়ে বসায়—বিশেষ করে তাঁদের জীবিকায় হাত দেওয়ায়। রামায়ণে এঁদেরি নাম রাক্ষস।

রাক্ষস শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে—যারা নিজেদের ধন নিজেরাই রক্ষা করতে চায়। কেই বা চায় নিজের ধনসম্পদ যাকে-তাকে বিলিয়ে দিতে?

কৃষির সম্পদ তো এতোকাল ছিল ঐ আদিবাসী মুনিগণের অধিকারে। তখনকার দিনে ধন মানে সবাই ধান্য বুঝতেন। এখনো তাই ধনের অধীশ্বরী দেবী লক্ষ্মীর পূজামন্ত্রে পাই—

“লক্ষ্মীং ধান্যরূপাসি”—হে দেবী লক্ষ্মী তুমি ধানেরই প্রতিমূর্তি।

সেই ধনের মূল যে ধান্য তা যখন ঋষিরা অধিকার করতে চাইলেন তখন মুনিগণের সবাই প্রাণপণ করে বাধা দিতে এলেন।

মুনিরা সেই আদিযুগ থেকে জমিকে কি চক্ষে দেখতেন তার নিদর্শন আমরা পাই অথর্ববেদের দ্বাদশ কাণ্ডের প্রথম কাণ্ডিকায়। সেই কাণ্ডিকার ঋষি হচ্ছেন অথর্বা, আর দেবতা হচ্ছে ভূমি। কাণ্ডিকাটির ঋক্ সংখ্যা হচ্ছে তেষষ্টি। তার থেকে কিছু ঋক্ এখানে উদ্ধার করার লোভ সামলাতে পারছি না। একটি হচ্ছে—

যস্মামন্নঃ ত্রীহিববৌ

যস্মা ইমাঃ পঞ্চকৃষ্ণয়ঃ ।

ভূম্যৈ পৰ্জন্তপত্ন্য

নমোহস্ত বর্ষমেদসে ॥

অ-১২।১।৪২ ॥

—নমস্কার করি সেই ভূমিকে, যিনি পৰ্জন্ত বা মেঘের পত্নী, যিনি বর্ষার ধারায় মেদপূর্ণ হয়ে ওঠেন, সমস্ত অন্ন যাঁর, সমস্ত ধাতু ও যব যাঁর, পঞ্চগণের কৃষকও যাঁর ।

এই পঞ্চগণের কৃষক কারা? যদি পুরাণের সাক্ষ্য মানতে হয় তাহলে তো মনে হয়—যবন, শবর, নিষাদ, কিরাত ও পুলিন্দ—এঁরাই ছিলেন পঞ্চগণের কৃষক। বেদজ্ঞগ্নেরা বলে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ—এঁরাই ছিলেন পঞ্চকৃষ্টি বা পঞ্চজন। কে জানে—কি সত্য?

পৃথিবী—মা

আমরা এই কাণ্ডিকার একষটি সংখ্যক ঋকে পাচ্ছি—“কামত্বা” বলা হয়েছে ভূমিকে। এই কামত্বা শব্দের অর্থই তো কামধেনু। সবথেকে সুন্দর হচ্ছে ঐ কাণ্ডিকার শেষ ঋকটি। তাতে দেখি—

ভূমে মাতর্নিধেহি মা

ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ।

সংবিদানা দিবা কবে

শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাং ॥

অ-১২।১।৬৩॥

—হে মা ভূমি, তুমি আমাদের সর্বমুখে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।
তুমি কবি—যার মানে সর্বজ্ঞ—দিব্যালোক বা আকাশের সঙ্গে সংযুক্ত

হয়ে তুমি এই করো যেন আমরা শ্রীলাভ করি, বিত্তুতি লাভ করি।

জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বা মা বলে উল্লেখ করেছিলেন—প্রথম কোন দেশের মানুষ এ প্রশ্ন নিয়ে এখনো বাদানুবাদ চলেছে পণ্ডিতদের মধ্যে। ঐ মন্তব্যটি থেকে কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখছি যে—সেই প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই, কিংবা তারও আগে থেকেই আমাদের দেশের মানুষ মাটিকে ‘মা’ বলতেন।

ভূমির প্রতি যাঁদের এতখানি শ্রদ্ধা ছিল, তাঁরা যে সেই ভূমির অধিকার সহজে অত্বে নিতে দেবেন না, এ তো না বললেও বোঝা যায়। কঠিন বিরোধ বাধলো তাই সেই সব সাধারণ মুনিগণের সঙ্গে ঋষিগণের।

বিশ্বামিত্রের তপশ্চা

বিশ্বামিত্র পড়ে গেলেন মহা ফাঁপরে। কিন্তু দমবার পাত্র তিনি নন। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে পাই—প্রবলা নদী বিপাট ও শুতুদ্রী—যাদের বর্তমান নাম বিপাশা ও শতদ্রু—অতিক্রম করে তিনি এসেছিলেন গব্য অর্থাৎ চাষের জমির সন্ধানে। বহু চেষ্টায় যখন সেই জমির খোঁজ পেলেন, জমি চাষ করার বিচ্ছেদ পেলেন, তখন কি আর সে জমির মায়া ছাড়তে পারেন বা চাষের কাজ বন্ধ করতে পারেন? ছুটে গেলেন তাই তাঁর স্বজন দশরথের কাছে। দশরথ ছিলেন সূর্যবংশের রাজা। বিশ্বামিত্র নিজেও যে মিত্র বা সূর্যবংশের একজন তার কথা আমরা আগেই জেনেছি।

বিশ্বামিত্র ভাবলেন—“দশরথ আজকে রাজা। যদি তাঁর ছেলে রামকে দিয়ে চাষের কাজ করাতে পারি—তাহলে আর ঋষিরা চাষের কাজ করতে ভয় পাবেন না। কারণ জগতে চিরকালই মহৎ ব্যক্তির যা করেন, ইতর ব্যক্তিরও তা করতে দ্বিধা করেন

না। সেই পথেই ওই তাড়কা, মারীচ, সুবাহ প্রভৃতি রাক্ষসী ও রাক্ষস নিহত হবে। সফল হবে আমার যজ্ঞকর্ম।”

যজ্ঞের অর্থ

যজ্ঞ কি? যজ্ঞই ছিল সেই যুগে বেঁচে থাকার ও বড় হওয়ার একমাত্র উপায়। এই যজ্ঞ শব্দের একটি অতি অপূর্ব অর্থ করেছেন স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত এস. এ. ডাংগে। তিনি বলেছেন—

য = গতি বা চলাফেরা।

জ = জন্ম দেওয়া বা উৎপাদন করা শস্ত্র ও সন্তানের।

ন = বহুবচন সূচক।

এই তিনটি অক্ষর যুক্ত হয়েই (য+জ+ন=) যজ্ঞ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সুতরাং যজ্ঞের অর্থ হচ্ছে, সবাই একত্রে চলাফেরা এবং শস্ত্র ও সন্তানের উৎপাদন করা।

যজ্ঞ বলতে আবার আহার করাও বোঝায়। আজও বিজ-মাত্রকেই আহারে বসে একটি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। মন্ত্রটি এই—

“প্রাণায় স্বাহা ॥ অপানায় স্বাহা ॥ সমানায়

স্বাহা ॥ উদানায় স্বাহা ॥ ব্যানায় স্বাহা ॥

—প্রাণকে স্বাগত জানাই, অপানকে স্বাগত জানাই, সমানকে স্বাগত জানাই, উদানকে স্বাগত জানাই আর ব্যানকে স্বাগত জানাই।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান হচ্ছে পাঁচটি বায়ুর নাম। যা কিছু আমরা আহার করি তা যদি আমাদের শরীরের এই পাঁচটি বায়ুর পথ রোধ করে তাহলে আর আমাদের পক্ষে বাঁচবার ও বড় হবার কোন আশা থাকে না। কেবল যে আমাদের দেশের আচার্যরা এই কথা বলেছেন তা নয়। এই যুগের যারা চিকিৎসক তাঁরাও জানেন যে, ইউরোপের শরীর-

বিজ্ঞানে আছে পাঁচটি এমনি মৌলিক বস্তুর উল্লেখ—সেগুলি হচ্ছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার। মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, ঐ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সঙ্গে এই পাঁচটিরও বেশ মিল আছে। তাই আমাদের দেশে সেকালে আহারকে বলা হতো জীবনের মূল যজ্ঞ—বার অপার নাম—প্রাণকর্ম। কিন্তু একথা এই পর্যন্ত থাক। এখন বলি রামের কথা—বিশ্বামিত্র কিভাবে রামকে দিয়ে চাষ করাবার মতলব করলেন।

ব্যক্তিবাদ ও বিশ্ববাদ .

রামায়ণে দেখি রামের প্রথম শিক্ষা দিচ্ছেন গুরু বশিষ্ঠ। বালক রাম, তাঁর আর তিন ভাই ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে পাঠ নিচ্ছেন ঐ মুনির কাছে। মুনি বশিষ্ঠ তো আসলে ছিলেন কৃষিজীবী—তিনি বুঝতেন, ব্যক্তিবাদী শিক্ষা অর্থাৎ যে যা হয়ে উঠেছে বংশগতভাবে, তাই হয়ে উঠুক আরো ভাল করে। তিনি তাই কৃত্রিয় রাজপুত্রদের শেখালেন তাদের যোগ্য বিত্তা, শেখালেন রাজনীতি, অস্ত্রবিত্তা প্রভৃতি।

বিশ্বামিত্র কিন্তু রামকে দিতে চাইলেন বিশ্ববাদী শিক্ষা অর্থাৎ রাম যাতে কেবল শিকারজীবী না হয়ে কৃষির বিত্তাও শিখে সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠেন। এবং রামকে সেইভাবে সম্পূর্ণ মানুষ করে তুলতে পারলে রামের আদর্শে সমস্ত ঋষিতাত্ত্বিকদের মনে জীবিকা-বদলের ভয়ও যাবে দূর হয়ে।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ঋষি বিশ্বামিত্র বুঝেছিলেন যে, যদি কেবলমাত্র শিকারজীবী হয়েই থাকে ঋষি-গোষ্ঠী তাহলে তারা যাযাবর হয়েই থাকবে, আহারও তাদের নিত্য-নিয়মিতভাবে জুটবে না। কিন্তু সেই শিকারের সঙ্গে যদি তারা

কৃষির বিছাকেও শিখে ফেলে তাহলে আর তাদের অন্নভাব হবে না—উত্তরোত্তর তারা আরো উন্নতিই লাভ করবে স্থাবর হয়ে।

আজও তো দেখা যায় যে, কোন মানুষ যদি একটি মাত্র বিশেষ কর্মের ওপর নির্ভর করেন তাঁর জীবিকার জন্তে, তাতে অনেক সময় সেই বিশেষ কর্মের অভাব ঘটলে কি শোচনীয় হয় তাঁদের অবস্থা।

আমাদের চোখের সামনে তো এখনো জাগছে—স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে কি ভাবে স্বর্ণশিল্পীরা দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁরা যদি অণু কর্মে নিপুণ না হলেও অন্ততঃ কিছু জ্ঞান রাখতেন তাহলে অবশ্যই দুর্দশার ঘোর কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারতেন। যাক সে কথা।

রাধের আরও শিক্ষা ও সাধনা

বিশ্বামিত্র রামকে তাঁর বজ্রস্থলে নিয়ে যাবার পথে দুটি বিছা দান করলেন—একটির নাম বলা ও অপরটির নাম অতিবলা। ভট্টিকাব্যে সেই দুটি বিছার নাম বলা হয়েছে জয়া ও বিজয়া। কিন্তু সেই বিছা দুটি আসলে কি? বেশ মনে হয় চায় করার সিদ্ধান্তমূলক যে জ্ঞান, তাকেই বলা হয়েছে বলা বা জয়া—আর সাধনমূলক যে ক্রিয়া তাকেই বলা হয়েছে অতিবলা বা বিজয়া।

রাম তো শিকারী গোষ্ঠীর ছেলে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা সবাই ঘোড়া ছুটিয়ে দিগ্বিজয় ও শিকার করে বেড়াতেন। তাঁর বাবা দশরথের এমনি নেশা ছিল শিকারের যে, মৃগয়া করতে গিয়ে তো মানুষই মেরে ফেলেছিলেন। সে বর্ণনা পাই রামায়ণে সিন্ধুবধ উপাখ্যানে। বংশগত গুণ ও কর্মের প্রভাব স্বভাবতঃই দেখা দেয় বংশধরদের মধ্যে। রামের পক্ষে তাই অস্ত্রের প্রতি বা মৃগয়ার প্রতি জন্মগত মোহ থাকতেই পারে। সে কথা বিশ্বামিত্র ভাল করেই জানতেন—তাই

তিনি দশরথকে না ডেকে বালক রাম, যাঁর বয়েস তখন পনের বছর, তাঁকেই ডেকে নিলেন। কেন না রামের মন তখনো ছিল নরম—নতুন কিছু শিক্ষা নেওয়া তাই তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

প্রথমেই রামকে তিনি গল্প করে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইলেন—কেন রামের উচিত শিকারের সঙ্গে চাষের বিত্তাও আয়ত্ত করা। খুবই সম্ভব যে, তখন বিশ্বামিত্র রামকে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথাও জানালেন, যে বিশেষ অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন বশিষ্ঠের সংশ্রবে এসে। সেই হলো তাঁর রামকে বলা বা জয়া বিত্তা দান।

ক্রমে রাম যখন ভালভাবে বুঝলেন চাষের উপকারিতা, তখন বিশ্বামিত্র তাঁকে শোনালেন কি করে চাষ করতে হয়। শেষে রামকে তাঁর যজ্ঞস্থলে নিয়ে গিয়ে নিজেই চাষ করে দেখালেন সমস্ত প্রক্রিয়া। কারণ কৃষি হচ্ছে আসলে একটি কর্ম—শুধু কথা দিয়ে তো কৃষির তত্ত্ব সবটুকু বোঝান যায় না। কাজে করে দেখালে তবেই তো সম্পূর্ণ হয় কৃষির শিক্ষা। সেই হলো রামকে বিশ্বামিত্রের অতিবলা বা বিজয়া বিত্তা দান।

ফল হলো তার চমৎকার। রাজার ছেলে রামও এসে চাষে লেগেছেন দেখে ঋষি-গোষ্ঠীর মনের দ্বিধা দূর হয়ে গেল। বধ হলো ভীষণা রাক্ষসী তাড়কা। বাকী যে সব মুনি তান্ত্রিকরা চাষের কাজে বিন্ম ঘটচ্ছিল রাম তাদেরও বধ করলেন অস্ত্র বলে—কাউকে বা তাড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ রাক্ষসরাও সরে গেল ঋষিদের চাষের কাজ থেকে দূরে।

রাম যে কৃষিজীবী হয়ে উঠেছিলেন তার সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা “রক্তকরবী” নাটকের প্রসঙ্গে। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় অংশে তা পাওয়া যায়। সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো একবার বলেছিলেন যে, অহল্যা শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘ন+হল্যা’ অর্থাৎ যে জমিতে হল দেয়া হয় নি।

অহল্যার রহস্যভেদ

এখন সেই অহল্যার কথা বলি :

নিজের যজ্ঞ নির্বিন্ধে শেষ করতে পেরে বিশ্বামিত্র মহাখুশী।
কিন্তু সে যজ্ঞে তো রাম ছিলেন তাঁর সহায় মাত্র। এবার চললেন
বিশ্বামিত্র রামকে দিয়ে অহল্যা-উদ্ধার করাতে।

অহল্যার অর্থ তো আমরা কবিগুরুর কাছে জানতে পেরেছি।
এবার দেখা যাক—অহল্যা-উদ্ধারের অর্থ কি ?

অহল্যা-উদ্ধারের অর্থ হচ্ছে—অনাবাদী জমিতে চাষ করা।
বিশ্বামিত্র সেই কাজই করালেন রামকে দিয়ে। যাতে নিজের হাতে
চাষ করে রাম আরো দৃঢ়ভাবে বুঝতে পারেন—চাষ করার মূল্য।
কৃষক মাত্রেই জানেন—অনাবাদী জমিতে যখন প্রথম ফসল ফলে
তখন তার অপূর্ব শ্রী জাগে! সেই ফলন দেখে সবারই মনে হয়—
“মা লক্ষ্মী যেন হাসছেন!” সেই তো অহল্যা-উদ্ধার। রুক্ষ পাথর
হয়ে পড়েছিল যে জমি যাতে ফুল ফল কিছুই ছিল না—সেই পাষাণী
অহল্যা রামের চেষ্টায় আবাদ হলো, পাথর ঢেকে গেল, নতুন
ফসলের তাজা রঙে ও রসে। শোভা হলো চোখ জুড়ানো।

এবার চললেন বিশ্বামিত্র আরো একথাপ এগিয়ে। ঋষি ও
মুনির সমন্বয় ঘটবার একটি মস্ত সংকল্প জেগেছে তাঁর মনে। তাই
রামকে নিয়ে গেলেন সীরধ্বজ জনকের দেশে - মিথিলায়। প্রাচীন
মিথিলা হচ্ছে বর্তমান বিহার প্রদেশে।

কৃষির প্রসার

আমরা আগে দেখেছি যে, বিশ্বামিত্রের প্রথম অভিযান শুরু হয়
বর্তমান যুগের সিদ্ধুউপত্যকার কাছাকাছি কোন অঞ্চলে। এখন
তো তাঁর সেই অভিযান এসে পৌঁছল বিহার প্রদেশে। এর থেকে
বেশ বোঝা যায় না কি যে, কৃষিকর্ম তখন উত্তর ভারতের কতখানি

অংশ জুড়ে প্রচলিত ছিল? এই প্রশ্নে মনে পড়ে মুনি কপিলের নাম। তাঁর আশ্রম বা তপোবন ছিল সাগরদ্বীপে। বলা বাহুল্য মুনি কপিলও ছিলেন কৃষিজীবী। অর্থাৎ সিদ্ধুপত্যকা থেকে শুরু করে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত সমস্ত উত্তরখণ্ডেই ছিল তখন সেই কৃষিজীবীদের প্রভাব। আবার ঐ মুনি কপিলের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়েছিলেন সূর্যবংশের রাজা সগরের বাট হাজার পুত্র—যার ফলে তাঁরা সবাই হয়েছিলেন ভগ্নীভূত। এর থেকেও বেশ বোঝা যায়—মুনিপন্থীদের সঙ্গে কি বিষম বিরোধ ছিল সেই যুগে ঐ ঋষিপন্থীদের প্রতিষ্ঠিত সূর্যবংশের। যাক, সে কথা।

জনক ও সীতা

এখন সীরধ্বজ জনকের কথা বলি। সীরধ্বজ শব্দের অর্থ কি?

সীর = লাঙল + ধ্বজ = চিহ্ন অর্থাৎ সীরধ্বজ মানে হচ্ছে লাঙলই যার চিহ্ন। জনক শব্দেরও এক অর্থ হচ্ছে—কৃষক।

সীতার জন্মকাহিনী এই যে—রাজা জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করতে করতাই একটি মেয়ে কুড়িয়ে পান, তারি নাম রাখেন সীতা।

সীতা শব্দের অর্থ আমরা আগেই জেনেছি, লাঙল-পদ্ধতি। তাই সন্দেহ জাগে যে জনক চাষের পদ্ধতিকে এতই ভালবাসতেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র মেয়ের নাম আদর করে রেখেছিলেন সীতা।

বিশ্বামিত্র চাইলেন ঐ চাষী জনকের মেয়ের সঙ্গে শিকারী দশরথের ছেলের বিয়ে দিয়ে, মুনি ও ঋষিদের অবাধ মিশ্রণের পথ প্রসারিত করে দিতে। সে যুগে এ অতি অসামাজিক কাজ ছিল, বর্তমান যুগে যেমন অসবর্ণ বিবাহ অসামাজিক। কিন্তু বিচক্ষণ বিশ্বামিত্র সেই গুরুতর অসামাজিক কাজ নিষ্পন্ন করতে গেলেন—তার শুভ ফলের কথা বিবেচনা করে। সমন্বয় ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

ওদিকে জনক পণ করেছিলেন যে, তাঁর কথা সীতাকে সেই লাভ করবে যে ভঙ্গ করতে পারবে হরধনু ।

ধনু বা অস্ত্রের প্রতি শিকারীর মোহ তো স্বভাবগত । শিকারী তো অস্ত্রের উপরেই নির্ভর করেন তাঁর জীবিকার জন্য—তাই অস্ত্রের প্রতি তাঁর প্রবল আসক্তি তো থাকবেই । রাম কিন্তু সেই আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র—এই দুই গুরুর শিক্ষায় । সভাসমক্ষেই তিনি তাই স্বীকার করলেন সেই কথা—এই হলো হরধনুর্ভঙ্গের রহস্য ।

কিন্তু দশরথ রাজী হলেন কি করে রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে দিতে ? তিনি তো শিকারী গোষ্ঠীর রাজা—কি কারণে কৃষক গোষ্ঠীর রাজার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে ফেললেন ? মনে হয় প্রথম যৌবনে শিকারভ্রমে সেই যে সিদ্ধুমুনিকে বধ করেছিলেন তিনি, তাতে মুনি বা কৃষিপন্থীদের সঙ্গে তাঁর যে বিরোধ জেগেছিল সেই বিরোধ দূর করার বাসনাতেই দশরথ ঐ অসামাজিক বিবাহে রাজী হয়ে গেলেন । নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেল তাঁর চার ছেলের সঙ্গে জনকের বংশের চার মেয়ের । মুনি ও ঋষিদের সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠলো ।

পরশুরাম—পিভৃগভকুল

পরশুরাম কিন্তু অত সহজে সমন্বয় ঘটতে দিলেন না । বিষম বিরোধ বাধালেন তিনি ঐ ব্যাপারে ।

এই পরশুরাম কে ? পুরাণে তাঁর যে পরিচয় পাওয়া যায় তার থেকে মনে হয়—তিনিই প্রথম অস্ত্র প্রয়োগে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন । এমনও হওয়া আশ্চর্য নয় যে, তিনিই প্রথম অস্ত্র আবিষ্কার করেন । তাঁর অস্ত্র ছিল পরশু বা কুঠার । সে অস্ত্র মুঠো করে ধরে চালাতে হতো, ছুঁড়ে মারা যেত না দূরস্থ শত্রুকে । কিন্তু

সেই অস্ত্র দিয়েই তিনি একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। ক্ষত্রিয়দের প্রতি তাঁর আক্রোশের কারণও খেঁহু বা পৃথিবী। পরশুরামের বাবা ছিলেন জমদগ্নি, তাঁর যে কামধেনু ছিল রাজা কার্তবীৰ্য্যার্জুন সেটি জোর করে দখল করেন। তারি শোধ নেবার জন্তে পরশুরাম তাঁর অস্ত্র চালাতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, পিতার আজ্ঞায় তিনি ঐ কুঠার দিয়ে তাঁর মায়েরও শিরশ্ছেদ করেন।

অস্ত্র যেই আবিষ্কার করে, জগতে সেই হত্যালীলায় মাতে। এর একটি ভীষণ উদাহরণ আছে বাইবেলে। আদম ও ইভের দুই ছেলে ছিল—আবেল আর কায়েন। কায়েন একদিন অস্ত্র আবিষ্কার করে ফেললো—সেই অস্ত্রের প্রথম পরীক্ষা করলো সে, তার নিজের ভাই আবেলের ওপর। এমনিই হয়। আজও তো দেখা যায়—ছোট ছোট ছেলেরা ছুরি বা অমনি কোন অস্ত্র হাতে পেলে তার ধার পরীক্ষা করে পাশের ছেলেটির ওপরেই। কিন্তু সে অল্প কথা। এখন পরশুরামের কথাই বলি।

অস্ত্র চালনা করতে শিখে পরশুরাম কেবল মানুষ মেরেই বেড়ান নি। আমরা জানি, শিকার করতে গেলেও ঐ অস্ত্র চালনা জানতে হয়। সুতরাং অস্ত্রবিদ পরশুরাম যে শিকারের পদ্ধতিও স্থাপন করেন—তা স্বভাবতই মনে হয়। তাঁর মাতৃহত্যা করার কাহিনীর মধ্যেও একটি রহস্যের আভাস পাওয়া যায়।

পরশুরামই সম্ভবত সকলের প্রথমে নিজেকে জামদগ্ন্য অর্থাৎ পিতা জমদগ্নির পুত্র বলে পরিচিত করেন। তার আগে সবাই পরিচয় দিতেন মায়ের নামে। যেমন দেখি—বিষ্ণুর আর এক অবতার বামনকে, আদিত্যও বলা হচ্ছে। আদিত্য শব্দের অর্থ হলো অদিতির পুত্র। বামনের মায়ের নাম ছিল অদिति। পরশুরামই সেই মাতৃগত পরিচয় ত্যাগ করে পিতৃগত পরিচয় দিতে শুরু করেন। কে জানে—এই কারণেই তাঁকে পুরাণে মাতৃহত্যাকারী বলা হয় কিনা।

গোত্র ও প্রবর

এখানে একটি কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। সে হচ্ছে এই যে—পরশুরাম, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি যে সব নামের উল্লেখ আছে পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে সেই সেই নাম কোন একটিমাত্র ব্যক্তির নয়। প্রত্যেকটি নাম হচ্ছে গোষ্ঠী, বা কুল, বা বংশগত। তাই আমরা দেখি—বিভিন্ন যুগের কাহিনীতে ঐ সব নামই বারবার উল্লিখিত। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, কোন এক নামের ব্যক্তি যুগযুগান্ত ধরে বেঁচে আছেন। আসলে বেঁচে আছেন তাঁদের বংশধারা, তাঁদেরই নামে। সেই বংশধারা এখনো পর্যন্ত আছে জগতে—তাই এখনো আমাদের দেশে সবাই, বিশেষ করে যাঁরা বেদের শাসন মানেন তাঁরা আদি ঋষিদের নামে তাঁদের গোত্র ও প্রবরের পরিচয় দেন।

পরশুরাম কিন্তু বিরোধ বাধাতে এসে পরাস্তই হলেন রামের কাছে। তার প্রথম কারণ মনে হয়—সমস্বয়কামী বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মিলিত দল তখন বেশ ভারি হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের চাপে পরশুরামের সংখ্যালঘু দল পাত্তাই পেলেন না। আরও একটি কারণ মনে হয়—রামের অস্ত্র ছিল ধনুর্বাণ, রামই তো তখন সেই সমস্বয়কামী সংখ্যাগুরু দলের অগ্রণী। পরশুরামের ছোট্ট দল তাঁদের হাতে ধরা কুঠার দিয়ে দূর থেকে নিক্ষিপ্ত বাণের প্রতিরোধ করতে পারলেন না। বেশ এগিয়ে গেল মুনিদের সঙ্গে ঋষিদের সমস্বয়, রাম ও সীতার বিবাহের ফলে। পিতৃগতকুলের লোকেরা সেই ব্যাপারে কোন বাধা দিতে পারলেন না।

কিন্তু মাতৃগতকুলের সবাইও কি সেই অনাচার নীরবে সহ করেছিলেন?

না, তা করেন নি। তারি প্রমাণ হচ্ছেন দশানন রাবণ। তিনি দ্বীপময় ভারতের একাংশ থেকে এলেন এগিয়ে, হরণ করলেন

সীতাকে। যাতে পত্নীহারী রাম সমস্বয়ের কাজে আর এগোতে না পারেন।

রাবণের দশমুণ্ডের রহস্যভেদ

রামায়ণে পাই রাবণের ছিল দশটি মুণ্ড। এ অসম্ভব কল্পনা কেমন করে জাগলো, এ প্রশ্ন অনেককেই আকুল করে। রাবণ পরিচয়ে ব্রাহ্মস হলেও ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণদেরও যে দশ মাথা ও দশ মুখ ছিল তার একটি মন্ত্র পাই অর্থববেদে। সেই মন্ত্রের ঋষি হচ্ছেন গরুড়ান আর দেবতা হচ্ছে ব্রাহ্মণ। মন্ত্রটি এই—

ব্রাহ্মণো জজ্ঞে প্রথমো

দশশীর্ষো দশাস্ত্রঃ।

স সোমং প্রথমং পপৌ

স চকারারসং বিষম্॥

আঃ।৬।১॥

ব্রাহ্মণ প্রথম জন্মেছিলেন—তাঁর ছিল দশটি মাথা ও দশটি মুখ। তিনিই প্রথম সোম পান করেছিলেন, নষ্ট করেছিলেন বিষের ছুঁই রসকে।

—ব্রাহ্মণ বলতে যে সে যুগে কুবিজীবী বা চাষীকে বুঝাতো তা আমরা আগেই জেনেছি। তাঁদের যে গণতন্ত্র ছিল, তাকেই কি কাব্য করে বলা হয়েছে দশ মুণ্ড ও দশ মুখ? আজও আমরা তো প্রায়ই বলি—

“দশে মিলে করি কাজ।

হারি জিতি নাহি লাজ॥”

এ কথাটি কি ঐ দশাননের কাল থেকে চলে আসছে?

বাস্তবিক পক্ষে কোন কাজই তো কখনো একা নিষ্পন্ন যায় না। আর ঐ যে বিষকে অরস বা ছুঁইরসবর্জিত করে তাঁরা প্রথম সোম বা সঞ্জীবনী সুধা পান করেছিলেন তার অর্থ কি এই যে, চাষীরাই নানা শস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে শেষ পর্যন্ত ধান ও যব

প্রভৃতিকেই খাও বলে খুঁজে বের করেন? এই পরীক্ষা করতে গিয়ে কত জনকে বিষফল বা বিষময় শস্য খেয়ে প্রাণ হারাতে হয়েছে তার খবর আজকে আর কে বলবে? কিন্তু ঐ মন্ত্রটিতে যেন সেই আভাস রয়েছে। এর থেকে বেশ বোঝা যায়, কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে তবে মানুষ চাবের কাজে অগ্রসর হয়েছিল সেই আদ্যুগে অন্নের জন্য।

আচার্য সায়ন অবশ্য বলেন যে, ঐ মন্ত্রটি তক্ষক সম্বন্ধে। নাগদের মধ্যে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। সেই নাগরাও যে মুনিগোষ্ঠী তা আমরা পরে জানতে পাব। কিন্তু বেদের ঐ মন্ত্রটি থেকেই যে রাবণের দশ মুণ্ডের কল্পনা জেগেছিল, তা বেশ বোঝা যায় না কি?

রাবণ ও মাতৃগতকুল

রাবণ যে মাতৃগতকুলের তাও জানতে পারি তাঁর 'নৈকষেয়' নাম থেকে। দিক্ষা ছিলেন রাবণের মা। যদিও রাবণের পিতা ছিলেন বিশ্ববা—যিনি বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ও ঋষি—কিন্তু মা রাক্ষসী ছিলেন বলেই রাবণের রাক্ষস পরিচয় ঘটে যায়। শুধু তাই নয়, রাবণ পিতৃধনের অধিকারও লাভ করেন নি। মাতুলগোষ্ঠীর কাছ থেকেই লঙ্কার অধিকার পান।

রাবণের প্রাণপণ চেষ্টাও নিষ্ফল হয়ে গেল। তিনিও পারলেন না সেই যুগে মুনি ও ঋষির সমস্বয়কে বাধা দিতে। উর্পেট সীতা হরণ করার ফলে রাম পেলেন মহা স্নযোগ। তখনকার বিভিন্ন গণগোষ্ঠীকে একত্রিত করে, তাদেরই সাহায্যে রাবণের লঙ্কাগড় অবরোধ করলেন। সেই মিত্রসেনার মধ্যে ছিল, বানরগণ, ঋক্ষ বা ভল্লুকগণ, পক্ষিগণ প্রভৃতি নানাবর্ণের নানা গোষ্ঠীর লোক।

গণ ও প্রভীক

আজকে আর সেই সব গণের মানুষকে আমরা জন্তু-জানোয়ারের দল বলে ভাবতেই পারি না। কারণ মানব-সভ্যতার প্রাচীন তত্ত্ব

যাঁরা খুঁজে বের করেছেন বর্তমানে তাঁরা বলেন, ঐ সব জীবজন্তু ছিল এক-একটি গণের প্রতীক। সেই প্রতীক চিহ্ন আজো প্রচলিত আছে বিভিন্ন সভ্য দেশে, যেমন বৃটেনের প্রতীক সিংহ, জার্মানীর শ্বেন পক্ষী, রাশিয়ার প্রতীক ভল্লুক ইত্যাদি। কিন্তু সে কথা থাক।

গণশক্তি

এই গণশক্তির বা মিত্রসেনার অভ্যুত্থানের মধ্যেই লুকোনো আছে রামের অকালবোধন করে শক্তিপূজা করার কাহিনীর মূল সূত্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ চণ্ডী থেকে আমরা জানতে পাই যে, যখন দেবতাদের সকলের শক্তি বা তেজ একত্রিত হয় তখনি উদ্ভব ঘটে পরমাশক্তি দেবী চণ্ডীর।

আবার দেবী দুর্গা যে কৃষির অধিদেবতা, তাও জানা যায়—ঐ পূজার প্রথমে যে নবপত্রিকা প্রবেশ বা নানা শস্য ও ফলের গাছ পুজো করতে হয়, তার থেকেই।

লংকাদহনের রহস্য

রাবণের পরাজয়ের আরো কিছু কারণ আছে। তার প্রথম হচ্ছে লঙ্কাদহন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটি প্রশ্ন করে গিয়েছেন ‘রক্তকরবী’ নাটকের গ্রন্থ পরিচয়ে যে, “স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহলে লেজের আগুনে ভস্ম না হয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠত।” এটিকে তাঁর মন্তব্য না বলে প্রশ্ন বললাম এই কারণে যে, এর একটি উত্তর আছে। রাবণের লঙ্কা সোনারই ছিল—তবে সে সোনা কৃষিজ সোনা বা শস্যের সমৃদ্ধি—তাই লেজের আগুনে তা ভস্ম হয়েছিল। রাবণের রাজত্বে সমূহ খাড়াভাব ঘটে গেল যুদ্ধের সূচনাতেই। খাওয়ার অভাব হলে কোন যোদ্ধা, তা সে যত বড় বীরই হোক, যুদ্ধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

রাবণের পরাজয়ের নির্ধাত কারণ রামের ধনুর্বাণ ও ব্রহ্মাস্ত্র।

রামায়ণে যদিও পাই যে, রাবণও ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে এই কারণে যে, যখন রাবণের প্রিয় পুত্র মেঘনাদকে বধ করলেন লক্ষ্মণ তখন রাবণ শক্তিশেল, যা নাকি বল্লম বা বর্শার মত ছুঁড়ে মারতে হতো, তাই দিয়ে লক্ষ্মণকে আঘাত করলেন। রাবণ ধনুর্বাণ ব্যবহার করতে জানলে পুত্রহত্যা করে বাণেই বিদ্ধ করতেন দূর থেকে। কিন্তু এসব তর্কের কথা।

ব্রহ্মাস্ত্রের কথাই বলি। ব্রহ্মাস্ত্র হচ্ছে সেই অস্ত্র যা শত্রুর নাভিমণ্ডলে প্রয়োগ করতে হয়। আয়ুযুদ্ধে সে অস্ত্র ব্যবহার করার রীতি ছিল না সেই আদি যুগেও যেমন এখনো নেই। তাই একালের কুস্তিগীর বা মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে নিয়ম এই যে, তাঁরা কখনো প্রতিযোগীর নাভিমণ্ডলে আঘাত করেন না। রাবণ রামের হাতে সেই নাভিমণ্ডলেই আঘাত পান এবং সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন।

সীতাহরণ রহস্য

অনেক মনে করেন যে, রাবণ সীতা হরণ করেন, মানে ভারতবর্ষ থেকে লাঙল পদ্ধতিকেই কোন উপায়ে লুপ্ত করে দেন। কিন্তু একটা সমগ্র দেশ থেকে চাষের পদ্ধতিটাকে লোপ করতে পারে কি করে একটি অগ্নি দ্বীপের মানুষ এসে? ইংরাজদের শাসন-কালেও তো দেখা গিয়েছিল যে, তাঁতীদের আঙুল কেটে দিয়েই মিহি কাপড় বোনার পথ বন্ধ করা হয়েছিল। বর্তমানের সঙ্গে যদি সেই দূর অতীতের ঘটনাগুলোকে আমরা মিলিয়ে নিতে পারি, তাহলে তো মনে হয় অবিশ্বাস করবার কিছু নেই সেই অতীতের কাহিনী। তবে হ্যাঁ, কাহিনী শুনিতে গিয়েছেন যারা, তাঁরা ছিলেন মহা মহা কবি, তাই সহজে তাঁদের বক্তব্য বুঝে নেয়া যায় না।

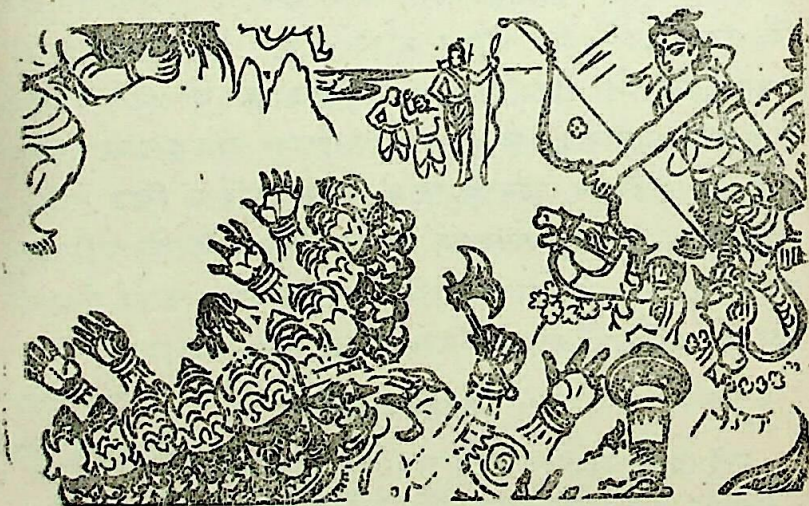
রামের আদর্শ

যাই হোক, রাবণবধ করে রাম অপূর্ব সমদর্শিতার কীর্তি স্থাপন করলেন। মুনির সঙ্গে ঋষির, চাষীর সঙ্গে শিকারীর, কর্মীর সঙ্গে

জ্ঞানীর যে পরম ঐক্য ঘটালেন তা আজো আদর্শ হয়ে আছে।
আজো বিশ্বাস করি আমরা রামরাজ্য ছিল পৃথিবীতে স্বর্গের তুল্য।

তবুও সবাই মেনে নেন নি রামের আদর্শ সেই সে যুগেও।
তঁারা ঘুরে বেড়াতেন বনে জঙ্গলে সবায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে। সুযোগ
পেলেই তঁারা ছুটে আসতেন লোকালয়ে জাগাতেন বিবম
উৎপাত। তঁরাই ছিলেন সেদিনের অনার্য বা অবৈদিকের দল—
যাঁদের নাম ছিল অদেবী অর্থাৎ দেবতা-ব্রাহ্মণ মানে না, অনিদ্ৰ
অর্থাৎ ইন্দ্রকে মানে না, অযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞ করে না, কৃষ্ণ অর্থাৎ
কালো মূর্তি, দাস বা দস্যু ইত্যাদি। তঁাদের বংশধরেরা এখনো
আছেন এদেশের আদিবাসীদের মধ্যে। সেই আদিবাসীদের
লোকগাথা থেকে স্মরণাতীত কালের নানা আভাস পাওয়া যায়।

রামের রাজত্বকালেই সত্যিকার বেদচর্চা শুরু হলো। সেই
চর্চার ফলশ্রুতি বা ক্রমবিকাশ দেখা দিল দ্বাপর যুগে। সেই দ্বাপর
যুগে আরো দেখতে পাই কিভাবে মুনিগোষ্ঠী ধীরে ধীরে ঋষিগোষ্ঠীর
ওপরে প্রভুত্ব বিস্তার করছেন। সে আবার আর এক অধ্যায়।



দ্বাপর যুগ

রাম ও বেদচর্চা

দ্বাপর যুগের কাহিনী এবার। সে কাহিনী শুরু করার আগে ত্রেতাযুগের শেষ দিকের আরো কিছু কথা বলে নিই।

রাবণ বধ হওয়ার ফলে রামের রাজত্ব বেগ জমে উঠলো। সমস্ত গণগোষ্ঠীর যাঁরা রামকেই রাজা বলে স্বীকার করে নিলেন, বেদের বিধানও তাঁরা মানলেন। রামের রাজকোষে উৎপন্ন শস্ত্রের চার ভাগের এক জমা দিতেন তাঁরা চাষ করার পরে। আর কৃষির ফলে অন্ন সংস্থানের একটি নিশ্চিত পথ পেয়ে ঋষিরা আশ্রমবাসী হয়ে মনের আনন্দে বেদচর্চা করতে অবকাশ পেলেন। তখনো কিন্তু বেদ ছিল ঋতি, যা গুরুর মুখ থেকে শুনে শিখতে হতো। মনে হয় সেই কাল থেকেই বিচার নাম হলো—গুরুমুখী।

তখন থেকেই প্রবর্তিত হলো একটি কঠিন নিয়ম। সেই নিয়ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর বৈশ্য—এই তিন উচ্চবর্ণই পেয়ে গেলেন বেদ ও যজ্ঞের অধিকার। কিন্তু শূদ্র যাঁরা, তাঁরা তা থেকে বঞ্চিত হলেন।

শূদ্র কারা

এই শূদ্র কারা ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। নানা শাস্ত্র থেকে অতি অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক

“ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি”-তে। তিনি বলেন, যে সব অবৈদিক জন বা গণ বৈদিক সভ্যতার আওতায় এসেছিলেন—তঁরাই হচ্ছেন শূদ্র। তঁরা অধিকার পেয়েছিলেন শুধু কায়িক পরিশ্রম করে ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর বর্ণের সেবা করবার। অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে তঁরা হয়ে গিয়েছিলেন দাস—বেদে যাঁদের অপর নাম দম্ব্য ছিল।

বেশ যনে হয় মুনিগোষ্ঠীর যে সব মানুষ ঋষিগোষ্ঠীর কৃষিকর্মে বাধা দিতে এসে পরাজিত হয়েছিলেন, মুনি ও ঋষিদের সমন্বয়বাদী সমাজে তঁাদের স্থান হয়েছিল সবায়ের নীচে, সবায়ের পিছে। আমাদের এই যুগেও তো যুদ্ধবন্দীরা প্রায় এমনি ব্যবহারই পেয়ে থাকেন সর্বত্র। কে জানে সেই প্রাচীন যুগে ঐ ভাবেই প্রথম দাস-ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়েছিল কিনা।

বেদের বহু মন্ত্রে আৰ্য ও শূদ্র এই দুটি শব্দ পাশাপাশি দেখতে পাই। তাই এই সন্দেহ জাগে যে, তখন যাঁরা ছিলেন বিজেতা, বেদবিদ্যায় শিক্ষিত, তঁরা নিজেদের আৰ্য বা ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে উল্লেখ করতেন। যাঁরা বেদবিদ্যায় শিক্ষা পেতেন না, যদিও সেবা করতেন আৰ্যদের, তঁরাই শূদ্র রয়ে গেলেন। আৰ্যজনেরা কায়িক পরিশ্রম বাঁচাবার জন্তেই তঁাদের দলে টেনেছিলেন মাত্র। আর যাঁদের তঁরা দলে টানতে পারেন নি, তঁরা তো অনার্য, অন্ত্যজ হয়ে উঠলেন। বৈদিক সাহিত্যে তঁাদের নাম—নিষাদ। সেই নিষাদরা নাকি নিজের গণ্ডী ছেড়ে যেতে রাজী হন না। কে জানে—আৰ্যরাই তঁাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন কিনা নিজেদের গণ্ডীর বাইরে? আর তার থেকেই ক্রমে সৃষ্টি হয়ে উঠেছে কিনা বর্তমান কালের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়?

শূদ্র-সমস্যা

এই প্রসঙ্গে মনে এসে যায় আমেরিকার ইতিহাস। জমির লোভে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি কি ভীষণ অত্যাচারই না করেছিলেন,

আমেরিকার আদিমতম অধিবাসী 'রেড ইণ্ডিয়ান'দের প্রতি। শেষ পর্যন্ত সেই রেড ইণ্ডিয়ানরা ছ' ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। একভাগ মেনে নিয়েছেন বিজেতাদের শিক্ষা ও সভ্যতা, কিন্তু তবু তাঁরা ইওরোপ থেকে আগতের সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে পারেন নি। বিজয়ী আমেরিকানরা তাঁদের অন্ত্যজ বলেই মনে করেন, আমাদের দেশের শূদ্রের মতই। আর এক ভাগ আছেন তাঁদের সেই প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কার নিয়ে, তাঁরা একেবারেই অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্য, আজো বাস করেন সংরক্ষিত অঞ্চলে।

আফ্রিকার ইতিহাসও একই প্রকার। অল্পবলে য়াঁরাই দেশ দখল করেন, তাঁরা পরাজিত দেশীয় মানুষের প্রতি এমনি ব্যবহারই করেন নিজেদের উন্নততর আভিজাত্যের গৌরবে। কিন্তু মজা এই যে, অন্ত উৎপাদনের জগ্রে সেই দেশীয় জনগণেরই সাহায্য নিতে হয়। আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ানরা সেভাবে সাহায্য করেন নি বলেই, ইওরোপীয়রা বাধ্য হয়েছিলেন কায়িক পরিশ্রমের সহায়রূপে নিগ্রো বা আফ্রিকার আদিবাসীদের নিয়ে যেতে। কিন্তু সে আবার অন্য কথা।

যজ্ঞের বিশ্লেষণ

আমরা আগেই জেনেছি যে, মুনিপন্থীদের নকল করেই ঋষি-পন্থীরা কৃষিকর্ম করতে শেখেন। শেষে তারই বৈদিক নাম হয়ে ওঠে যজ্ঞ। ত্রেতা যুগে সেই যজ্ঞ ক্রমশঃ বিশেষ রূপ লাভ করলো। রামায়ণে পাই রামচন্দ্র বহুবীর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এই অশ্বমেধ যজ্ঞের নিয়ম ছিল, রাজা ছাড়া কেউই এ যজ্ঞ করতে পারতেন না। একটি অশ্বের কপালে জয়তিলক পরিয়ে, নানা সৈন্যসামন্ত তাকে নিয়ে দিগ্বিজয়ে বের হতো। সর্বত্র জয় করে ফিরে এলে, রাজা সেই অশ্ব যজ্ঞে উৎসর্গ করতেন। ওই

দিগ্‌বিজয় করা মানে নানা দেশ থেকে কর আদায়ের ব্যবস্থা করা। সে কাজ করতে প্রচুর সৈন্য-সামন্ত প্রয়োজন হতো, অর্থাৎ তখনো সহজে কেউ চাইতো না রাজার প্রাণ্য কর নির্বিবাদে দিতে।

সেই যজ্ঞ কিভাবে নিষ্পন্ন হতো তার কথাও একটু বলি। রাজারাই তো করতেন সে সব যজ্ঞ, কিন্তু সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণরাই ঋত্বিক বা পুরোহিতের কাজ করতেন। ঋত্বিক দরকার হতো চার প্রকারের, চার প্রকার কাজ করতেন তাঁরা যজ্ঞে। তাঁদের প্রথম ছিলেন হোতা, তিনি ঋগ্‌বেদ থেকে মন্ত্র পাঠ করে দেবতাদের আহ্বান জানাতেন। দ্বিতীয় ছিলেন অধ্বর্যু, যিনি যজুর্বেদের মন্ত্র পাঠ করে অগ্নিতে আহুতি দিতেন, আর পুরোডাশ বা পিঠে, চরু বা পরমান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করতেন। তৃতীয় ছিলেন উদগাতা, যিনি সামবেদের মন্ত্র পাঠ করে অর্থাৎ গান করে দেবতাদের আনন্দ দান করতেন। চতুর্থ ছিলেন ব্রহ্মা, যিনি মৌন হয়ে সব কিছু তদারক করতেন, যজ্ঞের কোথাও কোন ত্রুটি হলে, অথর্ববেদের মন্ত্র পাঠ করে সংশোধন করে দিতেন। এইসব অনুষ্ঠানে যুপকাষ্ঠ ব্যবহার না করলেই যজ্ঞ বলা হতো, যুপকাষ্ঠ ব্যবহার করলে বলা হতো ক্রতু। অশ্বমেধকে তাই ক্রতু বলা হতো।

তা ছাড়া পোতা, নেষ্ট্রী প্রভৃতি নামের আরো ঋত্বিক ঐ মূল চার প্রকারের ঋত্বিকদের সহায়তা করতেন। সেই যজ্ঞের আরো এক নাম ছিল বিদথ। বিদথ শব্দের আর একটি অর্থ হচ্ছে সভা।

যজ্ঞের এই বর্ণনা থেকে বেশ মনে হয় না কি, এটি একটি বিরাট যগিযাড়ির ছবি? সেখানে একদল আছেন অতিথি-সজ্জনদের আপ্যায়ন করবার জন্তে, একদল আছেন রান্না ও পরিবেশের জন্তে, তৃতীয় দল আছেন গান-বাজনা শুনিয়ে অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে, আর চতুর্থ দল আছেন কোথায় কি ত্রুটি হচ্ছে তা সেরে নেবার জন্তে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, এখনো বিভিন্ন দেশে সবথেকে বড় বড় সমস্তার সমাধান করা হয় বিরাট বিরাট ভোজসভায়।

মুনিদের মধ্যে যাঁরা প্রধান বলে গণ্য হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই ঐ সব অভিজাত-সভায় নিমন্ত্রণ পেতেন। কিন্তু যাঁরা সাধারণ মুনিগোষ্ঠীর মানুষ তাঁরা পেতেন শুধু কায়িক পরিশ্রমের অধিকার। কারণ, তাঁরা সবাই শূদ্র বলেই গণ্য হতেন।

শূদ্র বিদ্রোহ

ত্রেতাযুগের শেষ দিকে সেই শূদ্রদের একজন, তাঁর নাম শম্বুক, তুংগভদ্রা নদীর তীরে বাস করতেন। তুংগভদ্রা নদীটি দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। শম্বুক যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন বেদের বিধান না মেনে। অর্থাৎ তিনি আবার চেষ্টা করেছিলেন সাধারণ মুনিদের নিয়ে রাজার শাসন উপেক্ষা করে নিজেদের মত চাষবাস করার। শম্বুকের স্ত্রীর নামও ছিল তুংগভদ্রা। কে জানে, তুংগভদ্রা-তীরের চাষের জমিটুকুকেই তিনি আপন স্ত্রীর মত মনে করতেন কিনা। কিন্তু রাজা রামচন্দ্র তাঁর ঐ বিদ্রোহের খবর পেয়ে, নিজে গিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করেন।

এর মধ্যে যেন রোমের ইতিহাসের দাস-বিদ্রোহেরই আভাস পাওয়া যায়। সাধারণ মুনিপন্থীরা স্বীকার করে নিতে পারেন নি সেই যুগে সমন্বয়কামী ঋষি ও মুনিদের গড়ে তোলা রাজতন্ত্রকে। ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তাই তাঁরা শম্বুকের অনুগামী হয়ে দলবঁধে। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থই হয়ে গেল। বিন্মিত হয়ে যেতে হয় দেখে যে, মুনিগোষ্ঠীর যাঁরা প্রধান, সেই বশিষ্ঠ প্রমুখরা কি করে সহ্য করে নিলেন মুনি-সাধারণের প্রতি এই অত্যাচার? অথবা রাজার পৌরোহিত্য লাভের সুযোগ পেয়ে তাঁরা ভুলেই গেলেন মুনি সাধারণের কথা? তবে দ্বাপর যুগের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে জানতে পারা যায় যে, মুনি-প্রধানরাও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কি গভীর চক্রান্ত করেছিলেন, যার ফলে পতন

ঘটলো সূর্যবংশের আর অভ্যুত্থান হলো চন্দ্রবংশের। সে কথা বলার আগে, বেদের চর্চা কেমন চলছিল সেই ত্রেতাযুগে, তার একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

বেদের বিভাগ—ব্রাহ্মণ

খুবই সম্ভব যে, রামরাজত্বের শেষদিকে স্বয়ং ঋষিরাও ভুলতে বসেছিলেন বেদমন্ত্রের মূল অর্থ; অথবা এও সম্ভব যে, তাঁরা যখন শিকারকেই একমাত্র জীবিকা না রেখে, তার সঙ্গে কৃষিকেও জীবিকারূপে গণ্য করলেন, তখন দরকার হয়ে পড়লো বেদমন্ত্রগুলিকে নতুনভাবে প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করার। তৈরি হয়ে উঠলো তাই, ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণকেই বেদের দ্বিতীয় অংশ বলা হয়। এর মধ্যেই পাওয়া যায় কোন্ বেদমন্ত্র কোন্ কাজে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে, আর পাওয়া যায় কিছু কিছু বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যাও।

আরণ্যক

ক্রমে চাষবাসের সমৃদ্ধির ফলে ঋষিরা আশ্রমবাসী হয়ে আরো বেশী অবকাশ পেতে লাগলেন। কৃষিকর্মে তো বর্ষার ছ'মাস ভূমিকর্ষণ, বীজবপন আর চারারোপণের কাজ করতে হয় এবং হেমন্তে ছ'মাস শস্য সঞ্চয়ের কাজ করতে হয়। বাকী ছ'টি মাস তাঁরা অথগু অবকাশ পেতেন। মৃগয়া বা শিকার অবশ্য তাঁরা ত্যাগ করেন নি, কিন্তু সে কাজ আর জীবনধারণের একমাত্র উপায় নয় বলেই প্রত্যেক ঋষিকেই ছুটে বেড়াতে হতো না। সেই অবসরে ঋষিরা এবং প্রধান মুনিরাও বেদমন্ত্রের সম্বন্ধে আরো চিন্তা করতে শুরু করলেন। তারই ফলে প্রকাশ পেতে লাগলো বেদমন্ত্রের আরো গূঢ়তর অর্থ। দেখতে দেখতে তৈরি হয়ে উঠলো, আরণ্যক যা হচ্ছে বেদের তৃতীয় অংশ। পণ্ডিতজনেরা বলেন, অরণ্যবাস

রা আশ্রমবাসকালেই ঐ গূঢ়তর ব্যাখ্যা উদ্ঘাটিত হয়েছিল বলেই সেই ব্যাখ্যা সমন্বিত অংশের নাম হয়ে গেল আরণ্যক।

উপনিষৎ

অন্নচিন্তার দায় না থাকলে উদ্বোধনী মানুষ কতখানি চিন্তাশীল হয়ে উঠতে পারেন তারই পরিচয় আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আবার এমনো দেখা যায় যে, যাঁরা চিন্তাশীল তাঁরা অনেক সময়ে আহালাদি করতেও ভুলে যান। সেই প্রাচীন কালেও তেমনি একটি সময় এসেছিল—যার নিদর্শন আজো জেগে আছে উপনিষদের মধ্যে। এই উপনিষদের মধ্যেই বেদমন্ত্রগুলির আরো গভীরতর অর্থ করবার ঝোঁক দেখা যায়। এই উপনিষদগুলি হচ্ছে বেদের চতুর্থ অংশ। এগুলিকে আবার বেদান্তও বলা হয়। বেদান্ত শব্দটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে—বেদের অন্ত বা শেষ। পূর্বাচার্যরা কিন্তু বলে গিয়েছেন যে, বেদের অন্ত অর্থাৎ গভীর মর্ম বুঝতে হলে, উপনিষৎ না পড়লেই নয়। সেদিক থেকে ঐ উপনিষৎ হচ্ছে বেদের আদি।

বেদের উদ্ভব

এই ভাবে একে একে এবং ধীরে ধীরে সমগ্র বেদের চারটি অংশ গড়ে উঠল। এ কথা বলা সম্ভব নয়, ঠিক কোন ঋষি বা কোন মুনি এ কাজ করেছিলেন, শুধু বলা যায় যে, তাঁরা সবাই একত্রে বসে নানা আলাপ-আলোচনা করতে করতেই তৈরি হয়ে উঠেছিল এই বেদমন্ত্র ও বেদের বিভিন্ন অংশ। সেই কথা বোঝাবার জন্তে কখনো বলা হয়েছে বেদ অপৌরুষেয়, আবার কখনো বলা হয়েছে প্রজাপতি ব্রহ্মাই বেদের স্রষ্টা।

বলতে বলতে মনে পড়ল, আমাদের দেশে যে সব প্রবাদবাক্য

ব্যবহার করা হয়, তার কথা। যেমন একটি প্রবাদ—“হালে পানি পায় না।” যখন কোন কাজ সহজে সিদ্ধ করা যায় না, তখন আমরা ঐ প্রবাদটি ব্যবহার করে থাকি। আর বাক্যটির থেকে এও বুঝতে পারি যে, কথাটি প্রথম উচ্চারণ করেছিল কোন নৌকার মাঝি। কিন্তু আজকে শত গবেষণা করেও জানা যায় না, প্রথম কবে, কোন দেশের, কি নামের মাঝি ঐ বাক্যটি ব্যবহার করেছিল। সেদিক থেকে ঐ সব প্রবাদ বাক্যগুলিও তো অপৌরুষেয় বা প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি। যাক সে কথা।

কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড

বেদের ঐ যে চারটি অংশের কথা আগে বললাম, যথা—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষৎ, বেদজ্ঞান তাকে দু'ভাগে বিভাগ করেছেন। সেই ভাগ দুটি হচ্ছে, কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ড। মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ অংশ দু'টিকে ফেলা হয় কর্মকাণ্ডের ভাগে, আর আরণ্যক ও উপনিষৎকে ফেলা হয় জ্ঞানকাণ্ডের ভাগে। মনে হয়, এই বিভাগ করেন বেদব্যাস। কারণ ব্যাস শব্দের অর্থ হচ্ছে, যা বৃত্তকে দু'ভাগ করে। এ কথা আরো মনে হয় এই কারণে যে, পুরাণে পাই, পুরুষবাই প্রথম বেদকে ত্রিধা বিভাগ করেন, তিনি তো বেদব্যাসের পূর্ব যুগের মানুষ। যাই হোক, এইভাবে কি করে কর্ম ও জ্ঞান আলাদা পথ ধরলো ও তার ফল কি হলো, তা ক্রমশঃ আমরা জানতে পাব।

ষড়্দর্শন

কিন্তু বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা এইখানেই শেষ নয়। ক্রমে আরো আলোচনা ও আরো বাদ সৃষ্টি হলো, সেই আলোচনা ছাঁটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ষড়্দর্শন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলো। এই ছাঁটি

হচ্ছে, পূর্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা, ত্রায় বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল। এই দর্শনগুলি প্রচারিত হলো এক এক ঋষি বা মুনির নামে। যেমন পূর্ব মীমাংসা বেদব্যাসের নামে, উত্তর মীমাংসা জৈমিনির নামে, ত্রায় গৌতমের নামে, বৈশেষিক কণাদের নামে, সাংখ্য কপিলের নামে, আর পাতঞ্জল বা যোগশাস্ত্র পতঞ্জলির নামে।

এর মধ্যে কপিলের সাংখ্য আর পতঞ্জলির যোগ একটু অত্যধরনের। এই দু'টি দর্শন মানুষের দৃষ্টিকে দেবতার দিক থেকে ফিরিয়ে, তার নিজের দিকে টেনে আনলো। পণ্ডিতজনেরা এই দু'টি দর্শনের সঙ্গে তাই বৌদ্ধ দর্শনের সাদৃশ্য খুঁজে পান। যাই হোক, ঐ দু'টি দর্শনই মানুষকে খুঁজতে শেখাল তার নিজের মধ্যে কি শক্তি আছে। আজকের দিনে আমরা যে সর্বত্র “আধ্যাত্মিকতা” বলে একটি শব্দ প্রায়ই শুনে পাই, তার মূল কথা হচ্ছে, নিজেকে জানা। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

“আত্মানং বিদ্ধি” ॥ অর্থাৎ আত্মাকে বা নিজেকে জান।

কারণ নিজেকে ভাল করে জানতে গেলে জগতের সবাইকে জানা যায়, নিজের মত করে। শোনা যায়, গ্রীস দেশের মহাজ্ঞানী সক্রেটিস তাঁর শিষ্যদেরও শিখিয়েছিলেন—

“নো দাইসেল্ফ্”—অর্থাৎ তুমি তোমাকে জানো।

এই আধ্যাত্মিকতার প্রথম বীজ আমরা পাই অথর্ব বেদে। সেই বীজ কালবশে অংকুরিত হয় ঐ সাংখ্য আর পাতঞ্জলে। আরো স্পষ্ট হয় সেই ধারা বাদরায়নি-প্রণীত ব্রহ্মসূত্রে। সেই অপূর্ব তত্ত্ব-গ্রন্থকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে আচার্য শঙ্কর, আচার্য রামানুজ, আচার্য মধু, আর আচার্য বল্লভ তাঁদের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ স্থাপন করেন, যার ধারা এখনো আমাদের দেশে প্রবাহিত।

মুনিপ্রতিষ্ঠিত চন্দ্রবংশ

এখন দেখা যাক, শম্বকের প্রাণদণ্ডের ফলে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

মহাভারতের থেকেই আমরা পরোক্ষভাবে জানতে পাই যে, শম্বকের প্রাণদণ্ড সর্বস্তরের মুনিদের মধ্যে গভীর আলোড়ন জাগিয়েছিল। তার আভাস দেখা যায় চন্দ্রবংশের ছেলে সংবরণের সঙ্গে সূর্যবংশের মেয়ে তপতীর বিবাহের মধ্যে। ঋষি বিশ্বামিত্র যেমন মুনিবংশীয় সীতার সঙ্গে ঋষিবংশীয় রামের বিবাহ ঘটিয়ে রাজতন্ত্রের পথ পরিষ্কার করেছিলেন সমন্বয়ের নামে, মুনি বশিষ্ঠও ঠিক বিপরীত বিবাহ ব্যবস্থা করে সূর্যবংশের প্রাধান্য লোপ করে চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। মুনিদের চক্রান্তেই সম্ভব হলে চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠা কিন্তু তা সফল করতে চার পুরুষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বশিষ্ঠ তো মাত্র তপতীর সঙ্গে সংবরণের বিবাহ-টুকু ঘটিয়ে দিলেন, তাঁর পুত্র শক্তি বিশ্বামিত্রের কোপে অকালেই মারা গেলেন। শক্তির পুত্র পরাশর ঠিক কতখানি কাজ করেছিলেন তার বিবরণ খুব স্পষ্ট নয়, হয়তো তখনো তাঁকে গোপন চক্রান্তেই লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। কে জানে, সেই কারণেই পরাশর বিষ্ণু-পুরাণ রচনা করেছিলেন কি না অর্থাৎ বিষ্ণুর আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন কি না পরোক্ষভাবে তাঁর স্বীয় গোষ্ঠীকে? তবে পরাশর শব্দটির অর্থ হচ্ছে হিংসক—এ কথাটি মনে রাখবার।

পরশরের পুত্র বেদব্যাস যা করলেন চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠার জন্য, তা যাঁরা মহাভারত পড়েছেন তাঁরাই জানেন। চন্দ্রবংশ যখন বিনাশের পথে এসেছিল, তখন বেদব্যাসই সেই বংশরক্ষা করলেন তাঁর মা সত্যবতীর আজ্ঞায়। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথম সংকলন করলেন সমগ্র বেদ—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ সমেত।

বেদ সংকলনের আনুমানিক কারণ

কেন এ কাজ তিনি করলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে স্বভাবতই মনে হয় যে, তিনি মনে প্রাণে বুঝেছিলেন, যতদিন ঐ ঋষিগোষ্ঠীর বিতাকে আয়ত্ত করতে না পারবেন মুনিগোষ্ঠী সমগ্রভাবে, ততদিন কিছুতেই সম্ভব হবে না ঋষিদের স্থাপিত সূর্যবংশকে হটিয়ে মুনিদের স্বগোষ্ঠী চন্দ্রবংশের অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার সঙ্গে একালের যুগন্ধর রাজা রামমোহন রায় মশায়ের চমৎকার তুলনা মেলে। রাজা রামমোহনই প্রথম মনে প্রাণে বুঝেছিলেন যে, যতদিন আমরা ভারতবাসীরা ইংরেজের যা কিছু বিত্তা সমগ্রভাবে আয়ত্ত করতে না পারব, ততদিন দুর্ধর্ষ ইংরেজদের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারব না। তাই তিনি আপন অধ্যবসায় বলে আগে নিজে ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শী হয়ে ওঠেন, এবং পরে সমস্ত ভারতবাসীকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার প্রাণপাত চেষ্টায় ব্রতী হন। আজকে আমরা ভারতবাসী মাত্রই জানি যে, সেই ভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের ফলেই ইংরেজরা বাধ্য হয়েছে ভারত ছেড়ে বিদায় নিতে।

বেদব্যাসও সেই দ্বাপর যুগে ঠিক তেমনভাবে চেয়েছিলেন, ঋষিদের বিত্তা আয়ত্ত করেই তাদের হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নেবেন। শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছিল তাঁর চেষ্টা। কিন্তু হায়, চিরসহিষ্ণু মুনিরা, যারা চিরদিন যুক্ত ছিলেন কৃষিকর্মে, অহিংসা ছিল যাদের জীবনের ব্রত, ঋষিদের আদর্শে কৃষ্ণণে তাঁরা গণতন্ত্র ছেড়ে রাজতন্ত্রের পথ ও হিংসার নীতি ধরলেন! সেই বিপর্যয়ের ফল রক্তাক্ত অন্ধরে লেখা আছে মহাভারতের ছত্রে ছত্রে।

কৃষ্ণের গুণতত্ত্ব

এখানে একটু মহাভারতের কথা আলোচনা করি। মহাভারত কাব্যের প্রধান চরিত্র বা প্রাণপুরুষ হচ্ছেন কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ, প্রথম

জীবনে গোপাল নামে আর উত্তরজীবনে চক্রী বা চক্রধারী নামে বিখ্যাত ছিলেন। কে জানে, কৃষ্ণই প্রথম চক্র আবিষ্কার করেছিলেন বলে চক্রী নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন কি না। আমরা জানি, যতদিন চক্র বিশেষ করে পাখি বা স্পোক লাগানো চাকা আবিষ্কৃত হয় নি, ততদিন সভ্যতা দ্রুতগতি লাভ করে নি। আবার চক্র শব্দের অর্থ একটি অর্থ হচ্ছে, চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র, যা নাকি রাজতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। তবে কৃষ্ণের আরো একটি বিশেষ গুণ ছিল। সে যুগে তাঁর মত কেউ রথ চালাতে পারত না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাই অর্জুন তাঁকেই সারথ্যে বরণ করেন। তাই কৃষ্ণের অপরা নাম হয়ে যায় পার্থসারথি। এ সবই তাঁর উত্তর জীবনের কথা। তাঁর প্রথম জীবনের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

প্রথম জীবনে তাঁর নাম ছিল গোপাল (এবং গোবিন্দ) এ কথা আমরা আগেই জেনেছি। পুরাণাদিতে পাই, কৃষ্ণই তাঁর প্রথম জীবনে ইন্দ্রমহোৎসব বন্ধ করে দেন। তাই ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে এগনি বৃষ্টি আরম্ভ করেন যে, কৃষ্ণের পালক-পিতা নন্দরাজের বৃন্দাবনাদি রাজত্ব ভেঙ্গে যাবার যোগাড়। কৃষির পথ সেই অতিবৃষ্টিতে বন্ধ হয়ে গেল। ভাগ্যে কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ছাতার মত উঁচু করে তুলে ধরলেন, তাই সবাই রক্ষা পেলেন। এখন এই পৌরাণিক কাহিনীর গূঢ় অর্থ কি তাই একটু খুঁজে দেখা যাক।

গোবর্ধন ধারণের রহস্য

ইন্দ্রমহোৎসব বা ইন্দ্রযজ্ঞ ছিল তখনকার দিনে চাষের জন্তে বৃষ্টির আরাধনা। বেদমন্ত্রে সর্বত্রই ইন্দ্রকে বলা হয়েছে বৃষভ অর্থাৎ যিনি বৃষ্টি দান করেন। তিনি বজ্রধারী, যে বৃত্র সমস্ত জলকে আবৃত করে রাখে, সেই বৃত্র বা মেঘকে তিনি অশনিপ্রহারে খণ্ড

খণ্ড করে বৃষ্টির শ্রোত বইয়ে দেন। বিশ্বামিত্র ঋষি তাই একটি মন্ত্রে বললেন—

ইন্দ্র ওষধীরসনোদহানি

বনস্পতিরসনোদন্তরীক্ষম্।

বিভেদ বলং ব্রুতুদে বিবাচো

অথাভবদমিতাভিক্রতুনাং ॥

। ঋ—৩।৩৪।১০ ॥

—ইন্দ্র দান করেছেন ওষধি, প্রতিদিন যে ওষধি আমাদের পোষণ করে, সেই দিনগুলিও তাঁরই দান। তিনি দান করেছেন বনস্পতি, যা মাথা তুলেছে আকাশে, সেই আকাশও তাঁরই দান। তিনি ভেদ করেছেন বলকে বা মেঘকে, তাই এসেছে বৃষ্টি। তিনি বধ করেছেন তাদের যারা আমাদের বিরুদ্ধে কথা কয়, কিম্বা যারা আসে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

আবার দেখি ঋষি বামদেব, যিনি ছিলেন গোতমের পুত্র, তিনিও তাঁর ইন্দ্রমূর্ত্তে বললেন—

অহং ভূমিমদদামার্যায়

অহং বৃষ্টিং দাণ্ডষে মর্ত্যায়।

অহমপো অনয়ং বাবশানা

মম দেবাসো অনু কেতমায়ন্ ॥

ঋ—।৪।২৬।২ ॥

—আমি (ইন্দ্র) ভূমি বা জমি দান করেছি আর্যগণকে। যারা আমাকে হব্যদান করে, সেই সব মর্ত্যজনকে আমি দান করি বৃষ্টি। কলকল শব্দকারী জল আমিই নিয়ে আসি। সমস্ত দেবতাই আমার সংকল্পের অনুগামী।

এই ছাঁটি মন্ত্র থেকেই আমরা জানতে পারি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কি

আর কেনই বা সে যুগে মানুষ তাঁর কাছে প্রার্থনা করত ধন-সম্পদ, বীরপুত্র-পরিজন, এক কথায় জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় যা কিছু। তাই ইন্দ্রযজ্ঞ ছিল সেকালে প্রধান ও প্রথম কর্তব্য।

গোবর্ধন ধারণের রহস্য

কিন্তু কৃষ্ণ তাতে বাধা দিলেন। কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, কৃষ্ণই মানুষকে জীবন-ধারণের জন্তে নতুন পথ দেখালেন, কৃষিকর্মকে বাদ দিয়ে। সেই পথ হচ্ছে, গোবর্ধন-ধারণ অর্থাৎ সাদা কথায় গোপালন-পদ্ধতি। কৃষ্ণ বললেন, অন্ন যদি নাই জোটে কেবল গো-দুগ্ধ পান করেই মানুষ প্রাণ ধারণ করতে পারে। তিনিই শেখালেন গো-শব্দের অর্থ কেবল পৃথিবী নয়, গরুও বটে। খুবই সম্ভব এই কারণেই কৃষ্ণ গোপাল ও গোবিন্দ নামে প্রখ্যাত হয়ে ওঠেন। আরো মনে হয়—সত্য ঘটনা হয়তো এই যে, অতি বৃষ্টির ফলে চাষের জমি ডুবে গিয়েছে দেখেই কৃষ্ণ সেদিন গোপালন-পদ্ধতির আদর্শ স্থাপন করে মানুষের বাঁচার ও বাড়ার ব্যবস্থা করলেন অশ্রু উপায়ে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে যা আছে তার কথা বলতে হয়। তাতে পাই—এক সময়ে গোপদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়েছিল, তখন কৃষ্ণের পরামর্শে তাঁরা ব্রাহ্মণদের কাছে অন্ন ভিক্ষা করেও ফল পেলেন না। কৃষ্ণ তাই ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করলেন ও শেষে গোবর্ধন ধারণ করে গোপগণকে রক্ষা করলেন। আগে আমরা গোবর্ধন ধারণের যে ব্যাখ্যা জানতে পেরেছি, ভাগবতের এই উপাখ্যান থেকেও তো তাই প্রমাণ হয়।

কে জানে, কৃষ্ণের এই গোপালন-পদ্ধতির প্রতিবাদেই তাঁর মাতুল কংস, তার ভাই দম্ভবক্র ও শিশুপাল, নাগবংশের কালীয়, মগধের জরাসন্ধ, পৌণ্ড্রবাসুদেব প্রভৃতি সবাই মরণপণ করেন

কিনা। তবে এঁরা সবাই যে কৃষকে গো-পালক বলে ঘৃণা করতেন, তা জানা যায়।

দ্বাপর যুগের নানা বর্ণনা থেকে জানতে পারি, গোপালন-পদ্ধতি কিভাবে প্রসারলাভ করেছিল। তখনকার দিনে প্রত্যেক রাজারই ছিল বিরাট গোগৃহ অর্থাৎ মস্ত গোয়াল। আর গোগৃহ থেকে গরু কেড়ে নিয়ে যাবার জন্তে রাজারা প্রায়ই তখন যুদ্ধে লিপ্ত হতেন, তার বহু কাহিনী পাই মহাভারত কাব্যে বা অগ্নি-পুরাণাদিতে।

হিংসা ও অহিংসা

এখানে কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের কথাও একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। বলরাম হল ব্যবহার করতেন, তাই তাঁর এক নাম হলী। কিন্তু হলকে তিনি কৃষির কর্মে ব্যবহার করতেন না, ব্যবহার করতেন অস্ত্র হিসেবে। কৃষিজীবীরা কি ভাবে যুদ্ধজীবী হয়ে উঠলো তারই যেন আভাস পাই হলকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে দেখে। রাজতন্ত্রের আদর্শ কিভাবে গণতান্ত্রিক মানুষকে হিংসার পথে ঠেলে দিল, তা সত্যিই ভাববার কথা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষ্ণ ও বলরামের জ্যেষ্ঠতাপুত্র ছিলেন অরিষ্টনেমি। তিনি গণতান্ত্রিক মুনিদের তিতিক্ষা বা ক্ষমাকেই আজীবন ধর্ম হিসেবে রক্ষা করেন। অহিংসার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে ওঠেন জৈনধর্মের তীর্থঙ্কর বা সিদ্ধপুরুষদের একজন। তখন তাঁর নাম হয়ে যায় নেমীনাথ।

জৈনধর্মের মূল কথা

এখানে জৈনধর্মের সম্বন্ধে কিছু বলে রাখি। জৈন ধর্মে যুগে যুগে দেখা দিয়েছিলেন চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর বা জিন— তাঁরাই ছিলেন জৈনধর্মের প্রবক্তা। তাঁদের সবাইকেই বলা

হয় মুনি। জৈনধর্মের প্রথম তীর্থঙ্করের নাম—ঋষভনাথ বা ঋষভদেব। অনেকে বলেন, ভাগবত মহাপুরাণে বিষ্ণুর এক অবতার, ঋষভদেবের যে চরিতকথা আছে, তিনিই ছিলেন জৈনধর্মের আদিগুরু। ভাগবতেও দেখা যায় ঋষভদেব মুনিদের মোক্ষধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু সে কথা থাক, জৈনধর্ম যে পথ ধরেছিল তার কথাই বলি।

জৈনধর্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে, অহিংসা আর ত্রিরত্ন। ত্রিরত্ন হচ্ছে—সত্য বিশ্বাস, সত্য বাক্য ও সত্য কর্ম। যদিও বেশ বোঝা যায় যে, জৈনধর্মও বৈদিক মতকেই অনুসরণ করতো, তবুও সে ধর্মকে অবৈদিক বলা হতো। কে জানে, জৈনধর্ম সমস্ত কথা বৈদিক ভাষায় প্রচার না করে সাধারণ মানুষের বোধগম্য প্রাকৃত ভাষায় প্রচার করার অপরাধেই এ অখ্যাতি লাভ করেছিল কি না। তবে এর মধ্যে মুনিপন্থীদের কথা থাকতেই যে ঋষিপন্থীরা জৈনধর্মকে উপেক্ষা করতেন, তা স্বভাবতই মনে হয়। আরো এক কথা, এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরাই, যাঁরা বৈদিক ব্যূহের বাইরে ছিলেন। অর্থাৎ সেই বৈদিক যুগেও জেগেছিল মুনিপন্থীদের বেদ-বিরোধী ধর্ম, যার ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ, সরল, সর্বজনগ্রাহ্য।

বৌদ্ধধর্মের মূলকথা

এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কথাও কিছু বলি। যদিও বর্তমানকালে জৈনধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিভেদ দেখা যায়, কিন্তু যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে, মূলে এ দুটি ধর্মের কোন ভিন্নতা নেই। বৌদ্ধধর্মেরও মূলে আছে অহিংসা ও ত্রিশরণরত্ন। বৌদ্ধধর্মের ত্রিশরণরত্ন হচ্ছে—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ॥

ধর্মং শরণং গচ্ছামি ॥

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ॥

অর্থাৎ বুদ্ধের শরণ নিয়ে চলেছি। ধর্মের শরণ নিয়ে চলছি।
সজ্জের শরণ নিয়ে চলছি।

জৈনধর্মে যাকে বলা হয়েছে সত্য বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্মে তাকেই
মূর্তিমন্ত বুদ্ধে আরোপ করা হয়েছে, তেমনি করে সত্য বাক্য রূপ
নিয়েছে ধর্মের মধ্যে, আর সত্য কর্মও রূপ নিয়েছে সজ্জের মধ্যে।

সত্য বিশ্বাস বলতে তো বোঝায় একটি ভাবকে, তার যতক্ষণ
একটি আদর্শ আমাদের সামনে না পাই, তাকে মানি কি করে?
সে যুগেও তাই দরকার হয়েছিল একটি আদর্শের। স্বয়ং বুদ্ধদেব
হয়ে উঠলেন সেই আদর্শ। আবার সত্য বাক্য বলতে হলেও তো
দরকার হয় একটি ধর্ম, যাকে অবলম্বন করে সত্য পালন করব বা
চলব, তাই ধর্ম হচ্ছে সত্য বাক্য প্রয়োগ করার পথ। তেমনি
সত্য কর্ম করতে হলেও দরকার একটি সজ্জ বা দলের, এ জগতে কোন
কর্মই একা করা যায় না। বৌদ্ধধর্মের ঐ ত্রিশরণ মন্ত্রের মধ্যে সেই
কথাই বলা হয়েছে, এবং তা যে ঐ জৈনধর্মের ত্রিরত্নেরই বিস্তৃত
রূপ তা বোধ হয় আমরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি।

কপিল ও বুদ্ধদেব

এখানে আর একটি কথা না বললেই নয়, সে হচ্ছে,
পণ্ডিতরা মনে করেন যে, বৌদ্ধদর্শনের মূল ভিত্তি হচ্ছে কপিলের
সাংখ্যদর্শন। কপিল যে মুনি ছিলেন, সে কথা আমরা গীতার
দশম অধ্যায়ে পাই, সেখানে আছে—

সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥

অর্থাৎ সিদ্ধদিগের মধ্যে আমি কপিল মুনি।

ভাগবতে পাই, এই কপিল মুনিই প্রথম মুনিদের মোক্ষধর্মের
প্রবক্তা, এবং তিনি ঋষভদেবের চেয়ে প্রাচীনতর কালের। তাই
সন্দেহ জাগে যে, জৈনধর্মেরও মূলে আছে ঐ কপিলের কথিত ধর্ম।

এদিকে আবার দেখি, বুদ্ধদেবের এক নাম শাক্যমুনি। তাঁর জন্মস্থানের নামও হচ্ছে, কপিলাবস্তু। কে জানে, সেইখানেই কপিল মুনির আদিবাস ছিল কি না। বাল্মিকীর রামায়ণে তো দেখি, রাজা সগরের ষাট হাজার ছেলে যজ্ঞের অশ্ব খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে হাজির হন উত্তর-পূর্ব দিকে বা ঈশান কোণে, সেখানেই ছিল মুনি কপিলের আশ্রম। বর্তমানে তো আমরা সাগরদ্বীপেই কপিলের আশ্রম আছে বলে জানি, কিন্তু সে স্থানটি তো অযোধ্যার উত্তর-পূর্বে নয়। কিন্তু এ তর্কের কথা না তোলাই ভালো।

তবে এখানে জৈনধর্মের চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান সম্বন্ধেও কিছু বলি। তিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের সমকালীন। প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাঁর বহু চিহ্ন খুঁড়ে বের করেছেন অজয় নদের তীর থেকে। এ কথাও আজকে আর তাঁদের অজানা নয় যে, মহাবীর ছিলেন বর্ধমান-অঞ্চলের অধিবাসী।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য

যাই হোক, জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁরাই অর্হৎ বা ভ্রমণ ছিলেন, তাঁরা সবাই নির্ভার সঙ্গে মুনিধর্মই পালন করতেন, ঠিক যে কথা বলা হয়েছে গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে—

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্

মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ॥

অর্থাৎ সংযত তাঁদের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, তাঁরা হচ্ছেন মুনি, মোক্ষলাভ করাই যাঁদের তপস্শ্রা।

জৈন ও বৌদ্ধ সবাই পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন, অর্থাৎ তাঁরা মানেন পিতৃযান, সেও তো আর এক বিরোধ বৈদিক ধর্মের সঙ্গে। বৈদিক ধর্ম পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বিশ্বাসী নয়, সেখানে তাই পাই দেবযানের কথা। কর্ম যাঁরা মানেন তাঁরা পুনর্জন্ম বিশ্বাস না করে পারেন না, তার মস্ত প্রমাণ হচ্ছে, বুদ্ধদেবের বিভিন্ন জন্মের কথায় পূর্ণ জাতক।

যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা তো কর্মেই বিশ্বাস করেন না। সেইখানেই তো মস্ত বিরোধ কর্মী বা অশিক্ষিতদের সঙ্গে জ্ঞানী বা শিক্ষিতদের। তাই দেখি, লৌকিক ভাষাতেই জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রচার, আর দেবভাষাতে বৈদিকধর্মের প্রচার। কিন্তু সেই দেবভাষা বা বেদের ভাষা যে কত জটিল, এবং তার চর্চা করা যে কত পরিশ্রমসাধ্য, তা বেদজ্ঞ মাত্রেই জানেন।

বৈদিক যুগে বিজ্ঞানদানের পদ্ধতি

এবার আবার মহাভারতের কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। দেখা যাক, কিভাবে সেই মুনি ও ঋষিদের সমন্বয়ের যুগে বিজ্ঞানদান করা হতো।

মহাভারতের আদিপর্বে কিছু উপাখ্যান আছে। তার থেকে জানা যায়, সেইকালে আচার্য কি পদ্ধতিতে ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন। বলাই বাহুল্য যে, তখনকার দিনে শিক্ষা বলতে শুধু ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদশিক্ষাকেই বোঝাতো। যাই হোক, সেই শিক্ষাদান কি ভাবে দেওয়া হতো তার কথাই বলি।

আরুণি নামে একটি ছাত্র আচার্যের আশ্রমে থেকে শিক্ষা নিতে গেলেন। আচার্য তাঁকে ভার দিলেন কৃষিক্ষেত্র রক্ষা করার। তখন ছাত্রকে যে শুধু লেখাপড়ার দিকটাই শেখানো হতো, তা নয়, শেখানো হতো সেই সঙ্গে কি করে বেঁচে থাকা যায় ও বড় হয়ে ওঠা যায়, অর্থাৎ সবকিছু জ্ঞানদান করতেন গুরু যে কোন একটি কর্মের মাধ্যমে, যে কর্ম উত্তরকালে ছাত্রের নিজের অন্নসংস্থান করার নিশ্চিত উপায় হয়ে উঠতো। আরুণিকে গুরু সেইভাবেই শিক্ষা দিতেন। একদিন আরুণি দেখলেন, কৃষিক্ষেত্রের আল ভেঙে গিয়ে সমস্ত জল সরে যাচ্ছে। বহু চেষ্টাই করলেন আরুণি বাঁধ দেবার,

কিন্তু কৃতকার্য হতে পারলেন না। অগত্যা আলের ওপর গুয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত গুরু নিজে তাঁকে খুঁজতে এসে, ঐ অবস্থায় দেখে খুব আনন্দ পেলেন শিষ্যের নিষ্ঠা জেনে। তাঁকে উপাধি দিলেন, উদ্দালক অর্থাৎ যিনি আল উঁচু করে তুলেছেন।

আবার উপনিষদে দেখি, ওই আরুণি উদ্দালক যখন দেখলেন তাঁর ছেলে শ্বেতকেতু আচার্যের কাছে শিক্ষা করতে গিয়ে, বিষম দণ্ড নিয়ে ঘরে ফিরেছেন, তখন নিজেই তিনি ছেলেকে অনাহারে থাকতে দিয়ে কি ভাবে শেখাচ্ছেন, অন্নই ব্রহ্ম। ক্রমে অবশ্য তিনি ওই শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মবিচার আরো তত্ত্ব শেখান।

অন্নের ভদ্র

এখানে অন্নের কথা আরো কিছু বলি। সামবেদে একটি মন্ত্র পাই আত্মা ঋষির, তার দেবতা ঐ অন্ন। তাতে বলা হয়েছে—

অহমস্মি প্রথমজা ঋতস্তু
পূর্বং দেবেভ্যো অমৃতস্তু নাম ॥
যো মা দদাতি স ইদেবমাবদ্
অহমন্নমন্নমদন্তুমস্মি ॥

সা—১৬৩৯৯॥

—আমি (অন্ন) জন্মেছি সকলের আগে, তখন ঋত বা জ্ঞান উৎপন্ন হয় নি, উৎপন্ন হয় নি দেবতার। আমি হচ্ছি অমৃতের নাম অর্থাৎ নাভিকেন্দ্র। যে আমাকে অন্নের সেবায় দান করে, সেই যথার্থ আমায় পালন করে। আর যে অপরকে ভাগ না দিয়ে আমাকে খায়, আমি তাকে নিঃশেষে গ্রাস করি।

উপনিষদে যে পঞ্চকোষের কথা আছে, তারও প্রথমটি হচ্ছে

অন্নময় কোষ। আবার গীতাতেও পাই—অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি ॥
অর্থাৎ অন্ন থেকেই জন্মেছে বিশ্বের যা কিছু।

বিজ্ঞাশিক্ষার প্রয়োজন

এই প্রসঙ্গে সত্যকাম যেভাবে গৌতম আচার্যের কাছে
বিজ্ঞালাভ করেন তার কথাও বলি। সত্যকামের কথা পাই ছান্দোগ্য
উপনিষদে। গৌতম তাঁকে গোরক্ষার ভার দিয়েছিলেন। সত্যকাম
পণ করেছিলেন যে, যতদিন গুরুর দেয়া চারশো গরু এক হাজারে
না দাঁড়ায়, ততদিন তিনি ফিরে আসবেন না আচার্যের কাছে। কিন্তু
সে অল্প গল্প।

সত্যকাম বা উদ্বালকের কাহিনীর উল্লেখ করছি এইটুকু শুধু
জানতে যে, সে যুগে একটি জীবিকা, তা হয় কৃষির নয় গোরক্ষার
সঙ্গে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হতো, যার ফলে ছাত্ররা জীবনে
অন্নসমস্যার সম্মুখীন হতো না। নিজের অন্ন উৎপাদন করবার
শিক্ষা যে পায়নি, সে কতকাল অন্নের ওপর নির্ভর করে বাঁচতে
বা বড় হয়ে উঠতে পারে?

বর্তমান যুগে আমরা শিখছি শুধু অর্থকরী বিজ্ঞা। কিন্তু
অর্থ তো অন্ন নয়, তা খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে না বা বাড়তেও
পারে না। যাক ও কথা।

চন্দ্রবংশের অভ্যুদয়

এবার দ্বাপর যুগে যে চন্দ্রবংশের অভ্যুদয় ঘটেছিল তারই
কিছু আলোচনা করা দরকার। প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-
ব্যাসের কৃপাতেই চন্দ্রবংশের বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। একদিকে
তিনি চতুর্বেদ সংকলন করে যেমন অপরূপ কীর্তি স্থাপন করলেন
বিজ্ঞার প্রচারে, অন্নদিকে তেমনি সর্বরকমে সেই বিজ্ঞা নিপুণ

ভাবে প্রয়োগ করলেন চন্দ্রবংশকে প্রতিষ্ঠিত করতে। আর তাঁরই জন্ম সম্ভব হলো ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম।

মহাভারতের মূল কাহিনী হচ্ছে ঐ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র ও পাণ্ডুর পঞ্চপুত্রের বিরোধ নিয়েই। গল্পটি বলি।

জ্ঞাতিবিরোধ ও প্রতারণা

পাণ্ডু তপস্যা করবার জন্মে বনে গিয়ে অকস্মাৎ মারা গেলেন। ছোট রাণী মাদ্রী তাঁর পুত্র দুটির ভার বড় রাণী কুন্তীর হাতে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে সহমতা হলেন। কুন্তী তাঁর নিজের তিনটি ও মাদ্রীর দুটি ছেলেকে নিয়ে ঋষিদের সঙ্গে ফিরে এলেন হস্তিনাপুরের প্রাসাদে। ঋষিরাই ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন, কিভাবে পাণ্ডু গত হয়েছেন। ছোট ভাই পাণ্ডুর শোকে কাতর ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও তাঁর পুত্রদের প্রাসাদেই স্থান দিলেন। ব্যবস্থাও করলেন নিজের ছেলেদের সঙ্গে ভাইপোদের একত্র শিক্ষা দেবার। শাস্ত্রবিদ্যায় তাঁরা কে কতদূর পারদর্শী হয়েছিলেন, তার তত বিবরণ না পেলেও, অস্ত্রবিদ্যায় যে তাঁরা প্রত্যেকেই সুদক্ষ হয়েছিলেন, তার বিস্তৃত বর্ণনা মহাভারতে আছে। কৃষিজীবী মুনিতান্ত্রিক চন্দ্রবংশ কি ভাবে শিকারজীবী ঋষিতান্ত্রিকদের অনুসরণ করলেন তা লক্ষ্য করবার। আচার্য্য ভ্রোণ ছিলেন কুরু ও পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু। দুর্যোধন কিন্তু গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন কৃষ্ণের ভাই বলরামের কাছে, হয়তো ভীমও তাঁরই কাছে গদাযুদ্ধ শেখেন। তবে দুর্যোধনই যে বলরামের অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তার বিশেষ উল্লেখ আছে মহাভারতে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজ্যের লোভে জ্ঞাতিবিরোধ শুরু হলো, কুরু ও পাণ্ডব এই দুই দলে। প্রথম থেকেই কুরুরা নিলেন

প্রতারণার পথ। বিষপ্রয়োগ ও জতুগৃহাদি নির্মাণ করে তাঁরা চাইলেন পাণ্ডবদের উচ্ছেদ। বিপদ বুঝে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের ভিন্ন করে দিতে চাইলেন, খাণ্ডবপ্রস্থে তাঁদের থাকতে বললেন। খাণ্ডবপ্রস্থ ছিল তখন বনাঞ্চল। পাণ্ডবরা তবু রাজী হলেন সেই বন হাসিল করে বসবাস করতে। খাণ্ডববন পুড়িয়ে তাঁরা গড়ে তুললেন তাঁদের রাজধানী, নাম হলো তার ইন্দ্রপ্রস্থ। ঐতিহাসিকরা বলেন, পুরানো দিল্লীর যে অংশের ইন্দরপৎ, সেখানেই ছিল প্রাচীনকালের ইন্দ্রপ্রস্থ।

সেই ইন্দ্রপ্রস্থে দানবশিল্পী ময় পাণ্ডবদের জন্তে বিরাট প্রাসাদ গড়ে দিলেন। তার শোভা ও সমৃদ্ধি দেখে কুরুরা হিংসায় জ্বলে মরতে লাগলেন। হস্তিনাপুরের প্রাসাদ তো ছিল বেশ পুরানো, কাজেই ইন্দ্রপ্রস্থের নতুন তৈরি প্রাসাদ দেখে কুরুদের চোখ টাটানো কিছুই অশ্চর্যের কথা নয়। সেই হিংসে আরো বহুগুণ বেড়ে উঠলো, যখন পাণ্ডবরা অন্ত্রবলে নানাদেশ জয় করে বহু ধনরত্ন এনে রাজসূয় যজ্ঞ করতে ব্রতী হলেন। নিমন্ত্রণে এলেন তখনকার ভারতবর্ষের সমস্ত রাজারা, তার সঙ্গে কুরুরা তো বটেই। সে যজ্ঞে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্ররাও সবাই যোগদান করেছিলেন।

কুরুরা আবার এক প্রতারণার জালবিস্তার করলেন। এবার তাঁরা কপট পাশাখেলার প্রস্তাব জানালেন শকুনি মাতুলের পরামর্শে, সেই ছলে পাণ্ডবদের সমস্ত ঐশ্বর্য হরণ করাই ছিল উদ্দেশ্য। পণ রেখে শুরু হলো খেলা। হেরে গেলেন প্রধান পাণ্ডব, যুধিষ্ঠির, তাঁর অশ্ব ভাইরা সবাই তো তাঁর অনুগামী ছিলেন। সর্বস্ব হারালেন তিনি ঐ জুয়াখেলায়, বিশেষ করে শকুনির হুঁষ্ট ছলনায়। ধৃতরাষ্ট্র অবশ্য প্রথম বারের খেলাকে খেলা বলেই উড়িয়ে দিলেন। তাই সেবারের মত রক্ষা পেলেন পাণ্ডবরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র হুঁচকানোর মুখ চেয়ে আবার ঐ জুয়াখেলার অনুমতি দিলেন।

সেবারে আর রক্ষা পেলেন না পাণ্ডবরা। সর্বস্বাস্ত্র হয়ে বারো বছরের বনবাস ও এক বছরের অজ্ঞাতবাস ভোগ করতে বাধ্য হলেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, ঠিক হলো অজ্ঞাতবাসকালে যদি তাঁদের পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহলে আবার বনবাস ভোগ করতে হবে আরো বারো বছরের জন্তে।

বৈদিক যুগে পাশাখেলা

এখানে পাশা খেলার সম্বন্ধে কিছু বলি। বৈদিক যুগ থেকেই, এ খেলার প্রচলন ছিল। পাশার অংকের নাম ছিল তখন কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, তার অর্থ যথাক্রমে—চার, তিন, দুই ও এক। কাজেই খেলায় যিনি কৃত ফেলতে পারতেন তিনিই বিজয়ী হতেন, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ফেলার অর্থ ছিল, ক্রমশই অধিক পরাজিত হওয়া। অথর্ববেদে এই সম্পর্কে একটি মন্ত্র আছে ঋষি অংগিরার, তিনি কিতববধকামনায় অর্থাৎ জুয়াড়ীকে হারিয়ে দেবার আশায় ইন্দ্রদেবতার কাছে প্রার্থনা করছেন—

কৃতং মে দক্ষিণে হস্তে

জয়ো মে সব্য আহিতঃ।

গোজিদ্ ভূয়াসমখজিদ্

ধনঞ্জয়ো হিরণ্যজিৎ॥

অ—৭।৫০।৮ ॥

—ডান হাতে পেয়েছি আমি কৃত, স্মৃতিরাজ জয়লাভ আমার বাঁ হাতের মুঠোয়। গরু, ঘোড়া, ধন বা সোনা সবই আমি জয় করে নেব।

কিন্তু ঐ কিতববধকামনা কথাটি থেকেই বোঝা যায় নাকি, জুয়াড়ীদের প্রতি তখনকার মানুষ কত বীতরাগ ছিলেন? অথচ সে যুগে ক্ষত্রিয় রাজা অক্ষকৌড়া, মৃগয়া ও যুদ্ধের আহ্বান পেলে পরাজুখ হতে পারতেন না, এই ছিল রীতি। কিন্তু সে কথা থাক।

কৃষি থেকে রাজ্য

ঐ দ্বাপর যুগের চন্দ্রবংশের সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করবার ব্যাপার। এই যে, কি ভাবে তাঁরা কৃষিজীবী মুনিতান্ত্রিক বংশের মানুষ হয়েও শিকারজীবী ঋষিতান্ত্রিকদের নকল করে রাজ্যলোভী ও প্রভু-লোভী হয়ে গেলেন। তাই দেখা যায় যে, বনে গিয়ে বারো বছর ধরে পাণ্ডবরা কেবল অন্ত্রলাভ করবার তপস্ব্যই করলেন, আর যোগাযোগ করতে লাগলেন নানা গণগোষ্ঠীর সঙ্গে, যাতে বনবাসের কাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অস্ত্র ও লোকবলে কৌরবদের পরাজিত করে রাজ্যলাভ করতে পারেন। গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী কি ভাবে রাজনীতির চর্চা ও প্রভুপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হলেন, তারি পরিচয় পাই আমরা মহাভারত কাব্যে। তিতিক্ষা ও অহিংসার কথা একেবারেই মুছে গেল পাণ্ডবদের মন থেকে। যাই হোক, মূল গল্পটি শেষ করি।

বনবাস ও অজ্ঞাতবাস পর্ব শেষ হলে, পাণ্ডবরা অবশ্য কৃষ্ণকে পাঠালেন দূতরূপে। তিনি পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের জন্তে মাত্র পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করলেন। কিন্তু গ্রামেই বাস করার যদি সাধ ছিল পাণ্ডবদের, তাঁরা তো বারো বছরে মহাসুযোগ পেয়েছিলেন বনের মধ্যে গ্রাম পত্তন করবার। তা তাঁরা করেন নি। তাই তাঁরা সন্দেহ হয় তাঁরা আসলে চাইছিলেন রাজ্যের আধিপত্য।

একবার যে মানুষ প্রাসাদে বা নগরে বাস করার সুখ বুঝেছে, সে কি আর গ্রামে বাস করার দুঃখ সহ্য করতে পারে? একথা সে যুগেও যেমন সত্য ছিল, আমাদের যুগেও তেমনি সত্য। বর্তমানে তাই দেখি, মানুষের সত্যতা হয়ে উঠেছে নগরকেন্দ্রিক। নগর ছেড়ে কেউ আর চাইছেন না গ্রামে ফিরে যেতে। যদিও নগরে মানুষের প্রাণধারণের যে মূল বস্তু, সেই শস্যই ফলে না। প্রত্যেকটি নগরকেই নির্ভর করে থাকতে হয় ঐ অবহেলিত গ্রামের ওপরেই আহালাদির জন্তে। আজকে যদি গ্রামের মানুষরা দল বেঁধে ঠিক

করেন যে, নগরে আর তাঁরা কোন শস্ত্র যেতে দেবেন না, তাইলে নগরবাসীদের কি কঠিন সমস্তার মধ্যে যে পড়তে হয়, তা বলার নয়। মনে পড়ে যায়, যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বোমার ভয়ে গ্রামের কেউ শহরে আসতে চাইতেন না, তখন বাধ্য হয়ে শহর-বাসীকে গ্রামে ছুটতে হয়েছিল, শুধু বোমার ভয়ে নয়, উদরান্নের জন্য। তবে গ্রামের মানুষও ব্যবসা বুঝেছেন, তাই গ্রামকে উপবাসী রেখে তাঁরা লাভের লোভে শহরেই এনে ফেলছেন গ্রামের শস্ত্রাদি। ফলে গ্রাম আজকে উৎসর্গে যেতে বসেছে। কিন্তু সে অন্য কথা।

সন্ধি কিন্তু হলো না কুরু-পাণ্ডবের। কুরুক্ষেত্রে সমবেত হলো উভয় পক্ষের সৈন্য। সেই মুহূর্তে অত্যন্ত চঞ্চল হলেন অর্জুন, কৃষ্ণকে বললেন, “কি করে আত্মীয়-স্বজনকে বিনাশ করি রাজত্বের জন্যে?”

গীতার ভঙ্গ

সেই সংকট মুহূর্তে কৃষ্ণ শোনালেন তাঁকে গীতা, যা হচ্ছে সমগ্র উপনিষদের সারাংশ। আমরা জেনেছি উপনিষৎ হচ্ছে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের চূড়ান্ত। যারা গীতার সঙ্গে অগ্ন্যাগ্ন উপনিষৎ মিলিয়ে পড়েছেন তাঁরা জানেন, গীতার কত শ্লোক ওই উপনিষদের শ্লোকের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। কিন্তু আগে যে কথা বলেছি যে, কর্মবাদী মুনিতাত্ত্বিকরা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠলেন জ্ঞানবাদী ঋষি-তাত্ত্বিক, সেই সত্য গীতার মধ্যে আরো প্রকট। তাই নয় শুধু, এ গীতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জ্ঞানবাদেরও বড় একটি ভঙ্গ, তার নাম ভক্তিবাদ। আবার সেই ভক্তিবাদকে আরো পুষ্ট করা হয়েছে মহাপুরাণ ভাগবতে।

যাঁরা ধর্মপ্রাণ, তাঁরা কিন্তু জানেন যে, গীতা হচ্ছে অনুত্তম যোগশাস্ত্র। যিনি আধ্যাত্মিক সাধনা করতে চান, এ গীতাই তাঁকে পথ দেখায়। গীতার সর্বশেষ শ্লোক থেকে আমরা জানতে পাই যে,

কৃষ্ণ ছিলেন যোগেশ্বর। তিনি কত বড় যোগবিদ, তার সম্যক পরিচয়ও আছে ঐ গীতার ছন্দে ছন্দে।

গীতার মধ্যে কৃষ্ণ যে সম্বন্ধের প্রচার করেন তা অতি অপূর্ব। ত্রেতা যুগে রামও ছিলেন সমদর্শী, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে গীতার মত কোন শাস্ত্র উচ্চারিত হয়নি। তবে রামের জীবনই তাঁর মহাবাণী। তিনি স্বয়ং কাজে করে দেখিয়ে গিয়েছেন, কি করে কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের, মুনির সঙ্গে ঋষির, বা অবিদ্বানের সংগে বিদ্বানের সম্বন্ধ ঘটানো যায়। কৃষ্ণ গেলেন আরো এক ধাপ এগিয়ে। প্রথম তো নিজে তিনি কোনদিন সিংহাসনে বসেন নি, কিন্তু তাঁর সময়ে যাঁরাই যোগ্যজন, তিনি নিজে ব্যবস্থা করে তাঁদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। তার চেয়ে বড় কথা, তিনি মুনি, ঋষি, জ্ঞা ও শূদ্র বা সাধারণ মানুষের সম্বন্ধ অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধ ঘটালেন, তারি নাম যোগ। যার মূল কথা হচ্ছে ঐ ভক্তি।

ভক্তির রহস্য

এই ভক্তি কি? ভক্তি হচ্ছে প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহ। প্রায়ই আমরা শুনি “যে কাজ করছ, ভক্তি করে করো।” “যা শিখছ, ভক্তি করে শেখো।” এর থেকেই বেশ বুঝি ভক্তি অর্থে আমরা কি বলতে চাই। এই ভক্তির অপর নাম শ্রদ্ধা। গীতায় পাই—শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্॥ অর্থাৎ যাঁর শ্রদ্ধা বা ভক্তি আছে, তিনিই লাভ করেন জ্ঞান।

গীতায় এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানবার কথা বলা হয়েছে। বাস্তবিক, শ্রদ্ধাভক্তির অভাব থাকলে কোন কিছুই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করা যায় না। কৃষ্ণ তাই চেয়েছিলেন যে, প্রত্যেকের মধ্যে যেন সেই শ্রদ্ধাভক্তি জেগে ওঠে, যাতে সার্থক

হয়ে উঠবে প্রত্যেকে। কিন্তু হায়! কুরুক্ষেত্রের উষর মাটিতে পড়ে কৃষ্ণের সেই গীতার অপূর্ব শিক্ষা ফলতে পেল কই?

রাম ও কৃষ্ণের তুলনা

এখানে একবার ত্রেতা যুগের আদর্শ চরিত্র রাম আর দ্বাপর যুগের আদর্শ চরিত্র কৃষ্ণ, এই দুয়ের একটু তুলনা করা যাক। রামকে বলা হয়, মায়া মনুষ্য, অর্থাৎ যদিও রাম স্বয়ং ব্রহ্ম, কিন্তু তিনি নরলীলা করতে এসে, ঠিক সেই কাজগুলিই করলেন, যা যে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব। তাই দেখি, রাবণকে বধ করার জন্যে, রাম সাধারণ মানুষের মতই বিভিন্ন গণের সবাইকে একত্রিত করে একটি মিত্রবাহিনী গঠন করলেন। এর মধ্যে ফুটে ওঠে ঋষিতান্ত্রিকদের বিশ্ববাদী আদর্শ ও সমাজ-চেতনা।

কিন্তু কৃষ্ণের মধ্যে দেখি, তাঁর শিশুকাল থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে এক অলৌকিক অসাধারণ মানুষের আভাস। তাঁকে তাই প্রথম থেকেই বলা হয়েছে—কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্॥ অর্থাৎ কৃষ্ণ হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবান। সেই মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কৃষ্ণের অতি শিশুকালে পূতনাবধে এবং ক্রমে তাঁর বয়েস বাড়ার সঙ্গে নানা নামের নানা অস্তুর আর নানা রাজাকে বধ করায়। সে সব কাজ তিনি প্রায়ই একা করেছেন। এর মধ্যে ফুটে ওঠে প্রাচীন মুনি-তান্ত্রিকদের ব্যক্তিবাদী আদর্শ ও আত্মচেতনা।

ভূভারহরণ কি?

সম্পূর্ণ মানুষ রাম যে মৈত্রী ও সহাবস্থান নীতির আদর্শ-স্থাপন করে গেলেন, তা একেবারেই টিকলো না দিব্য বা অলৌকিক মানুষ কৃষ্ণের যুগে। তাই দেখা গেল তীব্র জ্ঞাতি-বিরোধ। পুরাণে একে বলা হয় ভূভারহরণ। কৃষ্ণ সেই ভূভারহরণ করতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ভূতার কাকে বলে ? যখন জনসংখ্যার তুলনায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কমে যায়, তখনি ঐ ভূতার অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষ যখন নিজের অন্ন উৎপাদন করে না, আলস্য ও বিলাসের লোভে অস্ত্রের উপরে নির্ভর করে অন্নের জন্ম, তখনি ধীরে ধীরে ভূতার দেখা দেয়। সেই তার দূর করবার জন্তে কৃষ্ণ অত্যন্ত নির্মম ব্যবস্থা করেছিলেন। তার প্রমাণ, তিনি তাঁর নিজের বংশের অসম্ভব বৃদ্ধি দেখে নিজেই সে বংশ ধ্বংস করেন। শোনা যায়, যদুবংশ অর্থাৎ কৃষ্ণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে বংশের লোক সংখ্যা ছিল ছাপ্পান্ন কোটি, বর্তমান ভারতের লোক সংখ্যারও অধিক, কৃষ্ণ সেই বংশকেও রেহাই দেন নি এবং শেষে নিজেও এক ব্যাধের হাতে প্রাণ দেন। যদিও কৃষ্ণের স্ববংশীয়দের সংখ্যাটা গল্পের মতই শোনায, কিন্তু এ কথা না মেনে পারা যায় না যে, কতখানি শক্তি ও মনোবল থাকলে তবে লোকে পারে তার স্বজনদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করতে।

রামও অবশ্য তাঁর শেষজীবনে আত্মবিসর্জন করেন এবং কিছু মানুষ তাঁকে অনুসরণও করেন। কিন্তু কৃষ্ণ বা করে গেলেন তা বাস্তবিক নিরাসক্ত যোগী ছাড়া কেউ করতে পারেন না। সেদিক থেকে কৃষ্ণ সত্যি আদর্শ চরিত্র। নিজের কোন লাভ লক্ষ্য করে তিনি কখনো কোন কাজ করেন নি। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাই তাঁর ‘কৃষ্ণচরিত্র’ পুস্তকে কৃষ্ণের সেই আদর্শ আরো উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

কিন্তু কৃষ্ণের আদর্শ তাঁর প্রথম ও প্রধান শ্রোতা অর্জুনও সম্যক ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ হয়। কারণ দেখা যায়, গীতার উপদেশ শুনে কৃষ্ণের সম্মুখে অর্জুন যে বীর্য প্রকাশ করলেন, কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে আর সেই বীর্য অর্জুনের রইল না। কৃষ্ণ-হারা যত্নকুলের রমণীদের হরণ করলো গোপ-দম্ভারা অর্জুনের চোখের

সামনে, তবু অজু'ন তাঁর বিখ্যাত ধনু গাণ্ডীব তুলে দম্ভাদের দমন করতে পারলেন না।

শেষ পর্যন্ত একেবারে অবসন্ন হয়ে অজু'ন দ্বারকা থেকে ফিরে এলেন ও অত্যাচারী ভাইদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন মহাপ্রস্থানের পথে। বেদব্যাসের চেষ্টা, কৃষ্ণের শিক্ষার কি এই শেষ পরিণতি? অবশ্য এমনও হওয়া আদৌ আশ্চর্য নয় যে, কুরুক্ষেত্রের প্রচণ্ড যুদ্ধের ফলাফল দেখেই, সেই যুদ্ধের বিজয়ী মহারথীরাও বুঝেছিলেন অস্ত্র-প্রয়োগের ভয়াবহতা; তাই যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা জেগেছিল তাঁদের।

ঠিক এমনি ঘটনা তো আমাদের যুগেও দেখতে পাচ্ছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে শক্তিশালী জাতি মাত্রেই চেষ্টা করছেন, নিরস্ত্রীকরণের নীতি প্রতিষ্ঠার। সবচেয়ে যে ভয়ানক অস্ত্র পারমাণবিক বোমা, তার সম্বন্ধে নানা বিধি ও নিষেধ আরোপ করার জন্তে সমস্ত দেশেই আন্দোলন চলেছে। কিন্তু সে কথা থাক।

কলিযুগের সূচনা

পাণ্ডবরা শেষ পর্যন্ত প্রায় অপ্রাপ্তবয়স্ক পরীক্ষিতকে রাজ্যভার দিয়ে বিদায় নিলেন। এই পরীক্ষিতের রাজত্বকালেই কলিযুগ শুরু।

এখানে পরীক্ষিতের কথা কিছু বলি। যদিও পরীক্ষিত মুনিদেরই প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রবংশের নরপতি, কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা মুনিদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা দেখাতে ভুলে গিয়েছিলেন। মৃগয়া করতে গিয়ে তিনি হুবু'দ্বিবশে শমীক নামে এক মুনির গলায় মৃত সাপ জড়িয়ে দিয়ে এলেন। তার ফল হলো সাংঘাতিক। মুনিগোষ্ঠীর স্বজন নাগেরা সংহার করলো রাজা পরীক্ষিতকে, সম্ভবত বিষ প্রয়োগ করে। নাগবংশীয়েরা যে বিষ প্রয়োগ করতে দক্ষ ছিলেন, তা আমরা কালীয় নাগের কথা থেকেই জেনেছি। আর নাগেরা যে মুনিগোষ্ঠীর স্বজন তার প্রমাণ এই যে, মুনি জরংকারকেই তাঁরা কত্না বা ভগ্নি দান করেছিলেন, সেই জরংকার মুনির পত্নী মনসাদেবী হচ্ছেন, আস্তীক মুনির মা।

পরীক্ষিতের ছেলে জনমেজয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সমস্ত নাগবংশকে পুড়িয়ে মারবার পণ করলেন। আস্তীক মুনিই ক্রমে মাতুলগোষ্ঠীকে রক্ষা করলেন, জনমেজয়ের রোষবহি থেকে !

আত্মক্ষয়ী বিরোধ

এ সব বিবরণ আর না দিলেও চলে। এতক্ষণে আমরা বেশ বুঝে নিয়েছি যে, পরীক্ষিতের কাল থেকে শুরু হয়ে গেল মুনি-তান্ত্রিকদের নিজেদের মধ্যেই প্রবল বিরোধ। কে জানে, রাজ্য-লোভই এর মূলীভূত কারণ কিনা! তবে এ কথা সত্য যে, মানুষ একবার প্রভুত্ব করবার অধিকার পেলে, আর তা ত্যাগ করতে পারে না, বরং সেই অধিকার রক্ষা করবার জন্তে নিজের গণগোষ্ঠীর সর্বনাশ করতেও দ্বিধা করে না, এর-সাক্ষী ইতিহাস।

সেই বিষম বিরোধের ফলে কে আর সুস্থ চিন্তে জ্ঞানচর্চা করবে? তাই দেখি পরীক্ষিতের কাল থেকেই লুপ্ত হতে বসলো বেদের চর্চা। নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে মানুষ আর অবকাশই পেত না নিবিষ্ট মনে বিচার চর্চা করার। কি প্রবল হয়ে দেখা দিল সেই সমস্তা, কলিযুগের কাহিনীতেই তা আরো ভাল করে জানতে পাব।



কলি যুগ

ঐক্যের চেষ্টা

কলিযুগের প্রভাবেই ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে গেল বেদচর্চা। কলি কি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায়, সংকর জাতির উৎপত্তির ফলে যেমন জেগে উঠলো বিভিন্ন গণগোষ্ঠী, তেমনি কৃষি ও গোপালন ছেড়ে বা দৈহিক পরিশ্রমের পথ ছেড়ে অস্ত্রবলে রাজত্ব স্থাপন করবার লোভেও মানা খণ্ড খণ্ড রাজ্য স্থাপিত হলো। প্রবাদে তাই পাই, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। সেদিন রাজ্যের লোভে মানুষে মানুষে বিষম হানাহানি শুরু হয়ে গেল। সমস্ত ভারতবর্ষে দেখা দিল বিষম অনৈক্য।

ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা অবশ্যই চললো, কারণ মানুষ তখনো জানতো যে, ঐক্য না থাকলে সমাজ উৎসন্ন যাবে। তবে তখন কোন আদর্শ চরিত্র লোকের সামনে ছিল না, তাই প্রয়োজন হলো দেবদেবীর মূর্তিকল্পনার, যাতে সেই দেবদেবীর পূজার মধ্যে সবার মধ্যে ঐক্যবোধ জাগে।

শিবকে বলা হয় আদিদেব। বাস্তবিক পক্ষে ত্রেতা যুগে বা দ্বাপর যুগেও শিবের পূজা হতো, তার প্রমাণ আছে রামায়ণে ও মহাভারতে। পণ্ডিতজনেরা বলেন—“শিব ঐক্যবন্ধন” অর্থাৎ ঐক্য আনবার জন্মেই শিবের প্রয়োজন হয়। আবার শিবকে

বলা হয় সংহারের দেবতা। এই সংহার শব্দের অর্থও হচ্ছে, ছড়ানো। জিনিসকে গুছিয়ে একত্র করা, তাই চুল বাঁধার সংস্কৃত হচ্ছে বোঁ-সংহার।

শিবলিঙ্গের উদ্ভব

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জানিয়েছেন যে, অথর্ববেদের দশম কাণ্ডের সপ্তম কাণ্ডিকায় যে স্কন্তুসূক্ত আছে, তার থেকেই জেগে উঠে শিবলিঙ্গের পরিকল্পনা। স্কন্তু শব্দের অর্থ হচ্ছে স্তম্ভ। বাস্তবিকপক্ষে শিবলিঙ্গের রূপও একটি স্তম্ভের মূলভাগের মতই।

এই স্কন্তুকেই সবকিছুর মূল কারণ বলা হয়েছে বেদে, আর সেই স্কন্তুর কাছেই প্রার্থনা করা হতো পরব্রহ্ম বা পরমেষ্ঠি বা পরাবিচার নির্দেশ। ঐ কাণ্ডিকায় শেষ মন্ত্রে পাই—

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিহুসং তে বিহুঃ পরমেষ্ঠিনম্।

যো বেদ পরমেষ্ঠিনং যশ্চ বেদ প্রজাপতিম্।

জ্যেষ্ঠং যে ব্রাহ্মণং বিহুস্ তে স্কন্তুমনুসংবিদঃ ॥

—যাঁরা ব্রহ্মতে জানেন, তাঁরাই জানে পরমেষ্ঠিকে। যিনি পরমেষ্ঠিকে জানেন, তিনি প্রজাপতিকেও জানেন। আর যাঁরা ব্রাহ্মণকে জ্যেষ্ঠ মনে করেন, তাঁরাই সমগ্রভাবে জানেন স্কন্তুকে।

ঐক্যের প্রতীক সরস্বতী

ঐক্য না হলে বিচার চর্চা বা বেদের চর্চা আদৌ সম্ভব নয়। এ কথা সেদিনের বিদ্বানদের অজানা ছিল না। তাই দেখি, বিচার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর হাতে বীণা। বীণা হচ্ছে ঐক্যের প্রতীক। এই ঐক্যকে ইংরেজিতে বলা হয়, হারমনি। বীণাতে থাকে অসংখ্য স্তার নানা মাপের, সেগুলির প্রত্যেকটি ভিন্ন সুরে বাঁধা থাকে, কিন্তু

সবগুলির মধ্যে এমন একটি ঐক্য বা সামঞ্জস্য থাকে যে, বীণা বাজালে মধুর সুর জেগে ওঠে। সেই ঐক্য নষ্ট হলে বীণায় আর সুস্বর জাগে না, যুচে যায় বিজ্ঞার চর্চা, যুচে যায় সমাজের শৃংখলা।

বৈদিক যুগে অনৈক্য

সেই ঐক্য বা বিনয় যে বৈদিক যুগেও সবার মধ্যে ছিল না, তার কিছু প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যেই আছে। উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতুর অবিনয়ের কথা আগে বলেছি, এবার বলি যাজ্ঞবল্ক্যের কথা।

যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন আচার্য বৈশম্পায়নের শিষ্য। বৈশম্পায়ন তাঁকে যজুর্বেদ শেখান। বৈশম্পায়ন কি ভাবে যজুর্বেদ শেখেন, তার কথা আমরা পরে জানব। এখন বলি যাজ্ঞবল্ক্যের কাহিনী।

কোন সময়ে আচার্য বৈশম্পায়ন এক মহাপাপে লিপ্ত হন। পাপক্ষালনের জন্তে তিনি একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন। সমস্ত শিষ্যকে তিনি সেই যজ্ঞে ব্রতী হতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, “অন্যান্য ব্রাহ্মণরা সবাই নিস্তেজ, আমি একাই ব্রতী হয়ে এ যজ্ঞ সমাপন করব।”

অন্যের প্রতি কটাক্ষ করায় শিষ্যের দম্ভের পরিচয় পেয়ে বৈশম্পায়ন অত্যন্ত বিরক্ত হলেন, বললেন, “তোমার মত অবিনয়ী ছাত্রকে শিক্ষা দিয়ে আমি বিষম ভুল করেছি। তুই দূর হ।”

যাজ্ঞবল্ক্যও কম যান না, বললেন, “আমি তোমার মত গুরু শিষ্য হয়ে ভুল করেছি। তুমি যা বিছা আমায় দিয়েছ, আমি এখন তা বমন করে দিচ্ছি।”

কে জানে, আচার্য বৈশম্পায়নই শেষ পর্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে রক্ত-বমন করিয়েছিলেন কিনা বিষম শাস্তি দিয়ে, যেমন উপবাসের শাস্তি দিয়েছিলেন উদ্দালক তাঁর পুত্রকে।

যাই হোক, যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপন অধ্যবসায় ও তপস্শ্রা বলে, সূর্যের কাছে থেকে আবার যজুর্বেদ-বিদ্যা লাভ করেছিলেন। সেই যজুর্বেদ গুরু নামে পরিচিত হলো, আর যেটি তিনি ত্যাগ করেছিলেন সেটি পরিচিত হলো কৃষ্ণ নামে।

অনেকে আবার বলেন যাজ্ঞবল্ক্য আদৌ ত্রী হতে চাননি। আচার্যের যজ্ঞে, তাই ঐ বিপদ ঘটে। যে কারণেই হোক যাজ্ঞবল্ক্য যে বিরোধ বাধিয়েছিলেন তাঁর আচার্যের সঙ্গে, তাতে কোন দ্বিমত নেই।

উদালকের পুত্র শ্বেতকেতু অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর দম্ভ ত্যাগ করেছিলেন এবং পিতার কাছেই উপদেশ পেয়েছিলেন, অন্ন ব্রহ্ম থেকে শুরু করে, “তত্ত্বমসি” অর্থাৎ তুমি নিজেই সেই ব্রহ্ম, পর্যন্ত।

কিন্তু অনৈক্য বা বিরোধ যে সে যুগে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে রীতিমত ছিল, তার প্রমাণ পাই উপনিষদের শান্তিপাঠ মন্ত্রে। যেমন দেখি, সামবেদের অন্তর্গত কেন বা কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত কঠ উপনিষদে—

মা বিদ্বিবাবহৈ ॥ অর্থাৎ আমরা দুজনে (গুরু ও শিষ্য) যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে, তখন গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ তিক্ত হবার আশংকা ছিল বলেই, উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জগ্নো তাঁরা এই মন্ত্র একত্রে পাঠ করতেন।

আবার ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় উপনিষদের শান্তিপাঠ মন্ত্রেও দেখি—

“ঋতং বদিষ্ট্যামি ॥ সত্যং বদিষ্ট্যামি ॥”—সত্য বলব, সত্য কথাই বলব।

গুরু ও শিষ্য দুজনেই এই মন্ত্র পাঠ করছেন শুনলেই তো মনে হয় যেন বর্তমানকালের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী হলফ পাঠ করছেন—
“সত্য বই মিথ্যা বলিব না।”

এ হলফ সাক্ষীকে এই কারণেই করানো হয়, যাতে তিনি কোন ভাবে বিচলিত হয়ে মিথ্যা না বলেন। সেকালের গুরু ও শিষ্যের মধ্যেও তবে কি তেমনি কোন ছুঁতাবনা ছিল? তাইতো মনে হয় যে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে অটল বিশ্বাসের বন্ধন ঢিলেই হয়ে গিয়েছিল বিরোধ বা অনৈক্যবশতঃ।

বিচার মণ্ডে বিরোধ

এতো গেল একদিক, আবার আর এক দিকে দেখি, বিচার মধ্যে দুটি ভাগ জেগেছিল দিনে দিনে। তাই সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই যে, নারদ যখন হাজির হলেন সনৎকুমারের কাছে উপদেশ পাবার আশায়, তখন তাঁকে সনৎকুমার বুঝিয়ে দিলেন বিচার উত্তম ও অধম এই দুটি ভাগের কথা। উত্তম ভাগের নাম হচ্ছে পরাবিভা, যার দ্বারা মানুষের জ্ঞান বা ভাবগত বুদ্ধি জাগে; আর অধম ভাগের নাম হচ্ছে অপরাবিভা, যার দ্বারা মানুষের কর্মগত বুদ্ধি জাগে। কিন্তু সেই পরাবিচার নবমস্থানে পাই, অন্নই ব্রহ্ম; যদিও চূড়ান্ত স্থানে আছে ভূমা বা অবোধ বিস্তার।

কিন্তু কেবলি অবোধ বিস্তারের জ্ঞান বা ভাব নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না, প্রত্যেক মানুষের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন অন্ন। আগেই বলেছি যে, গীতায় পাই, “অন্নাৎ ভবন্তি ভূতানি ॥” অর্থাৎ জগতের সবকিছুই জন্মায় অন্ন থেকে।

অবশ্য উপনিষদেও অন্ন শব্দের উল্লেখ বহুবার আছে, সেখানেও আছে—অন্নাক্ষৌব খন্নিমানি ভূতানি জায়ন্তে ॥ অর্থাৎ অন্ন থেকেই জন্মায় এই জগতের সবকিছুই। কিন্তু সেই অন্ন বলতে যে সাধারণ খাওয়া পানীয় বোঝায়, তা কেউ মনে করেন না। বলা হয়েছে ওই উপনিষদেই যে, এখানে সবাই হচ্ছে—অমৃতশ্চ পুত্রাঃ ॥ অর্থাৎ অমৃতেরই পুত্র। কিন্তু সেই অমৃত যে আসলে অন্ন বা ডাল-ভাত

থেকেই জাগে, তা বোঝাবার চেষ্টা হয়নি। এর থেকেই বোঝা যায় যে, কি ভাবে বিরোধ দেখা দিল কর্মীদের সঙ্গে জ্ঞানীদের। জীবনধারণের সাধারণ কর্মকে ছেড়ে অনেকেই ছুটে গেলেন জ্ঞান বা ভাব নিয়ে চর্চা করতে। ফলে হলো এই যে, কর্মীদের ঘাড়ের ওপর বসে জ্ঞানীরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য ও শস্ত্রের ভাগ আদায় করতে লাগলেন। এই বিরোধ যে কি ভাবে সর্বস্তরে ছড়িয়ে গিয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়, যখন দেখি যে আজো পর্যন্ত সেই বিরোধ দূর হয় নি।

বিদ্যা নিয়ে বিরোধ কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল, তার কথা আরো একটু বলি। উপনিষদের পরের যুগেও দেখি, প্রবল প্রতাপাশ্রিত রাজ অমরশক্তির ছেলেরা লেখাপড়াই শিখতে চাইলো না। আলস্য ও বিলাসে যারা পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে পায়, তারা কোন্‌ দুঃখে বিদ্যা শিখতে যাবে? সেই বিদ্যা ফলিয়ে তো তাদের খেতে হতো না। রাজা তবু চাইলেন যে, ছেলেরা যেন মূর্খ না হয়। কিন্তু কোন গুরুই পারলেন না সেই সব দুষ্কৃৎ ছেলেদের শিক্ষা দিতে। কি ভাগ্যি, রাজা পরম পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মাকে পেয়ে গেলেন। অপূর্ব ব্যবস্থা করলেন বিষ্ণুশর্মা গল্পের মাধ্যমে রাজার ছেলেদের রাজনীতি শিক্ষা দিতে। তাঁর সেই গল্পগুলি ‘পঞ্চতন্ত্র’-নামে একটি বিখ্যাত পুস্তকরূপে আজো চলছে।

পণ্ডিত চাণক্য তাঁর শ্লোকমালায় বলে গিয়েছেন—বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্‌ যাতি পাত্রতাং ॥ অর্থাৎ বিদ্যা দেয় মানুষকে বিনয়, বিনয়ই বাড়িয়ে দেয় প্রসারতা।

এ কথা পড়লেই কি মনে হয় না যে, সেকালে ছাত্ররা ভুলে বসেছিলেন বিদ্যার সার্থকতা, তাই পণ্ডিতজনেরা বাধ্য হয়েছিলেন ছাত্রদের বুঝিয়ে বলতে যে বিদ্যা লাভ করলে কি উপকার হয়। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে অনৈক্য বা বিরোধ দূর করার জেতাই অমন ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় ছিল না।

অনৈক্যের ফল—বিভালোপ

অনৈক্য থাকলে বিভা কিভাবে লোপ পেতে বসে, তার বহু প্রমাণ তো আমাদের কালেও পেয়েছি এবং পাচ্ছি। কিছুকাল আগে দেখা গিয়েছিল, আমেরিকার মত উন্নত দেশেও রাস্তায় ঢেলে রাশি রাশি বই পুড়িয়ে দেয়া হলো, কেননা সে সব বই আমেরিকায় প্রচলিত মতের পরিপন্থী। এমন উদাহরণ আরো দেখা যায়, কিন্তু সে কথা বাড়িয়ে লাভ কি? শুধু এইটুকুই বিচার করতে সাধ হয় যে, ঐসব বিপক্ষবাদীদের বইয়ের মধ্যে কি স্বপক্ষবাদীদের গ্রহণ করবার কিছুই ছিল না?

মতানৈক্যের ফলে পুঁথি ও পুস্তকের ভাগ্যে এমন বিপর্যয় দেশে দেশে ও যুগে যুগে ঘটে, তার খবর রাখেন ঐতিহাসিকেরা। অনেকে মনে করেন যে, আমাদের দেশের বহু প্রাচীন পুঁথি যে আর খুঁজে পাওয়া যায় না—যদিও অগ্ন্য নানা পুঁথির মধ্যে সেগুলির নাম পাওয়া যায়—তার কারণ বিভিন্নকালে বিভিন্ন দলগত বিরোধের জন্ত বহুবার পুড়ে গিয়েছে বহু পুঁথিমালা। সেইভাবে পুড়েছে বিশ্ব-বিখ্যাত নালন্দার পুঁথিশালা বা তক্ষশীলার পুঁথিশালা প্রভৃতি।

অবৈদিক ধর্মের অভ্যুদয়

বেদের চর্চা লুপ্ত হবার এতো গেল একটি দিক। আর একটি দিক হচ্ছে এই যে, ধীরে ধীরে অবৈদিক ধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছিল। তার মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় জৈনধর্মের। মনে হয়, এই জৈনধর্ম সেই বৈদিক বা আর্যধর্মের অভ্যুত্থানের যুগ থেকে প্রায় সমান তালেই বেড়ে চলেছিল। তারপরে নাম করতে হয় বৌদ্ধধর্মের। এই দুই ধর্মের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, এই দুটো ধর্মই মানুষকে তার প্রভুত্বের মোহ ও রাজ্যের লোভ থেকে ফিরিয়ে কৃষি, পশুপালন, শিল্প ও বাণিজ্যের পথে চালিত করে। অর্থাৎ এক

কথায়, জ্ঞানবাদ বা ভাববাদের আদর্শ ছেড়ে কর্মবাদের আদর্শ স্থাপন করে।

যদিও বৈদিক সভ্যতার প্রথম যুগে কর্মেরই প্রাধান্য ছিল, কিন্তু অল্পচিন্তার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে ক্রমশ সবাই ছুটেছিলেন জ্ঞানের দিকে। তাই তাঁরা জৈন বা বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কর্মের কাণ্ড দেখে অক্লেশে তাকে অবৈদিক বলে ঘোষণা করলেন। এর মধ্যেও কিন্তু প্রচ্ছন্ন হয়ে রইল সেই আদি মুনি ও আদি ঋষির বিরোধের কাহিনী। অথচ জ্ঞানী, বিদ্বান বা ঋষিতান্ত্রিকেরা ধীরে ধীরে রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রকে তুলে ধরতে চাইছিলেন শেষ পর্যন্ত, আর কর্মী, অবিদ্বান বা মুনিতান্ত্রিকেরাই আবার সেই আদিম গণতন্ত্র স্থাপন করতে চাইছিলেন।

মজা এই যে, রাজার ছেলেরাই প্রচার করতে শুরু করলেন জৈন ও বৌদ্ধধর্মকে, যে রাজাদের সৃষ্টি হয়েছিল বৈদিকধর্মের অভ্যুদয়ে। একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে, বর্তমানে সামাজিক ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায়, পূর্ব যুগে তার অপর নাম ছিল ধর্ম।

বেদব্যাসের আরো কীর্তি—পুরাণসংগ্রহ

কিন্তু কলিযুগে বেদ নিয়ে যেসব কাণ্ড ঘটেছিল, তার কথা বিশ্লেষণ করতে হলে আবার একবার দ্বাপর যুগের কথায় ফিরে যেতে হয়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তো সমগ্র বেদের সংকলন করলেন মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ এই চারটি অংশে। কিন্তু সেই তাঁর শেষ কীর্তি নয়। পুরাণ নামে যে আঠারোখানি গ্রন্থ আছে এবং আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছেছে, তারও সংকলন-কর্তা ঐ ব্যাস। তবে সন্দেহ করবার অবকাশ আছে যে, ব্যাস উপাধি কেবল কৃষ্ণ-

দ্বৈপায়নেরই একার ছিল না। ভাগবত মহাপুরাণে পাই, কৃষ্ণ বলছেন যে, ব্যাসদের মধ্যে আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

এখানে আঠারো পুরাণের নামগুলি বলি—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, কুর্ম, বামন, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড। এর মধ্যে ভাগবত পুরাণের বক্তা হচ্ছেন ব্যাসের পুত্র শুকদেব আর শ্রোতা রাজা পরীক্ষিত, বিষ্ণুপুরাণের বক্তা হচ্ছেন ব্যাসের পিতা, পরাশর আর শ্রোতা তাঁর শিষ্য মৈত্রেয়। এইভাবে অত্যাঁচ পুরাণের প্রবক্তা হিসেবে অত্যাঁচ মুনির নামও পাওয়া যায়। এছাড়া আবার আঠারোখানি উপ-পুরাণও ব্যাসের নামে প্রচলিত।

পুরাণা দর তুলকথা

এইসব পুরাণ ও উপ-পুরাণের মধ্যে দেখি, বেদের ধর্মকেই গল্প করে বোঝানো হয়েছে। বিশেষ করে বেদে যাঁদের অধিকার ছিল না, সেই শূদ্রজনগণের জন্তুই প্রয়োজন হয়েছিল পুরাণের।

অনেকে মনে করেন যে, পুরাণ রচনা করার আদর্শ, এমন কি ‘পুরাণ’ এই নামটিও জৈনদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সে যুগের বৈদিক আচার্যরা।

যাই হোক, পুরাণ বা উপ-পুরাণে যে গল্পগুলি আছে, তা কিন্তু ভারি বিচিত্র। হঠাৎ শুনে মনে হয় যে, মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে এইসব গল্পের কোন যোগাযোগ নেই, কেবলি যেন ভাব আর স্বপ্নের কথা। সত্যিই কি তাই? যে সব গল্প কেবলি স্বপ্ন আর ভাব নিয়ে তৈরি, তা কি কখনো টিকে থাকতে পারে জগতে? না, তা কখনোই সম্ভব নয়। তাই জগতে রূপকথাও যেমন বেঁচে আছে, তেমনি বেঁচে আছে ঐ পুরাণ কথাও। যদি একটু চিন্তা করি আমরা তাহলেই বুঝতে পারি যে, রূপকথাই হোক আর পুরাণ

কথাই হোক, আসলে তার মধ্যে ধরা আছে প্রতিটি মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা। যাঁরা সেই সব কথা রচনা করেছেন, তাঁরা ছিলেন মহা মহা কবি।

কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান

একটি কথা, যত বড় কবিই হোন, কোন একটি অবাস্তব স্বপ্ন নিয়ে তিনি কখনই পারেন না সাহিত্য সৃষ্টি করতে। যা বাস্তব, যা জগতে সবাই দেখেছেন বা শুনেছেন, তাই নিয়েই কবি রচনা করেন তাঁর কাব্য বা সাহিত্য। পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁর সেই রচনার বহু অর্থই প্রকাশ পায় বহু পাঠক ও সমালোচকের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী।

এখানে সাহিত্য শব্দটির গূঢ় অর্থ কি তাই বলে নিই। যার সহিত পরিচয় হয়েছে, তারই বিবরণ হচ্ছে সাহিত্য। অর্থাৎ কোন কিছুকে খুব কাছে থেকে দেখতে, গুনতে বা জানতে না পেলে তার সম্বন্ধে কোন সাহিত্যই সৃষ্টি করা যায় না।

একটি উদাহরণ দিলে বোধহয় আরো ভাল হবে ঐ কথাটি বোঝাবার পক্ষে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।

কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা॥

এটুকু পড়ে আমরা সবাই বুঝতে পারি যে, এ কবিতাটি লেখার মূল প্রেরণা ছিল, একটি বাস্তব ঘটনা। আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করেছে, যেমন তার গর্জন, তেমনি তার বর্ষণ, সেইসময়ে যাত্রী নদীর কূলে এসে দেখল, সে একা, ওপারে যাবার উপায় নেই।

কিন্তু ঐই বাস্তব চিত্রটি থেকে কবি কিভাবে ভাবলোকে চলে গেলেন, তার প্রমাণ ঐ কবিতাটির বাকী অংশে উজ্জল হয়ে আছে। সেই ভাব যে কোন পাঠকের মনে কতখানি যে রসের সঞ্চার করে

তা বলার নয়। অথচ একটি প্রকৃত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কবিতাটি লেখা হয়েছে, এ কথা কি অস্বীকার করা যায়?

মরমিয়া কবি দাছদাসের একটি চমৎকার পদ আছে। তিনি বলেছেন—

রূপ কহৈ ম্যায় ভাও কো পাউঁ

ভাও কহৈ ম্যায় রূপ।

আপসমে দৌ পূজন চাইহৈ

পূজা অগাধ অনুপ ॥

অর্থাৎ রূপ বলছে আমি যেন ভাবকে পাই, আর ভাব বলছে আমি যেন রূপকে পাই। এইভাবে তারা দুজনে পরস্পরকে পূজা করছে, এ পূজা যেমনি অগাধ, তেমনি অনুপম।

এই পদটির সার্থক উদাহরণ ঐ পুরাণের গল্পগুলি। রূপের থেকে সেই গল্প পাঠককে অগাধ ভাবের লোকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু যাঁরা বিচক্ষণ, তাঁরা খুঁজে দেখেন এবং পানও, কি প্রকৃত ঘটনা থেকে গড়ে উঠেছে ঐ কাব্যময় গল্প।

বর্তমানে চর্চার অভাবে আমরা প্রায়ই পুরাণের মূল ঘটনা বা উদ্দেশ্য বুঝে নিতে পারি না, তাই অনেক সময় ঠিক বিশ্বাসও করতে পারি না গল্পগুলিকে। ভাবনা হয় এই যে, পুরাকালের মুনিঋষিরা যত উদ্ভট গল্প বলে গিয়েছেন, যার কোন সংগত অর্থ নেই। ভুলে যাই যে, আমাদের শিক্ষা সেই আদিকালের থেকে কতখানি সরে এসেছে। যাক সে কথা।

সূত্রগ্রন্থ ও স্মৃতিশাস্ত্র

একদিকে যেমন পুরাণের মধ্যে গল্প করে বেদের ধর্মকে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হলো, তেমনি ব্রাহ্মণদের জগ্নে তৈরি হলো নানা সূত্রগ্রন্থ, যা কল্পসূত্র ও গৃহসূত্র নামে পরিচিত।

সেগুলি এমনি সংক্ষেপে লেখা হলো যে, তার মর্মভেদ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই সূত্রগুলিতে নির্দেশ দেওয়া আছে, বেদমন্ত্র কি ভাবে কি কার্যে প্রয়োগ করতে হয়। তারি অনুসরণ করে আরো বিশদভাবে রচিত হলো স্মৃতিশাস্ত্র। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অংগিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শংখ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ, এই কুড়িজনকে আদি ধর্মশাস্ত্র প্রযোজক বা স্মৃতির প্রবর্তক বলে আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

তবে ঐ আচার্যেরা যা বিধান দিয়েছিলেন, তা প্রচার করেন প্রায়ই তাঁর শিষ্যেরা। যেমন দেখি, সব থেকে বেশী বিখ্যাত মনুর সংহিতা, তাঁর শিষ্য ভৃগু প্রচার করেন। সেই সব স্মৃতির বিধান মেনেই দিনে দিনে গড়ে উঠেছে আমাদের ধর্মপ্রাণ হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থা।

স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত বর্ণাশ্রমের গূঢ় রহস্য

স্মৃতিশাস্ত্রে কি আছে? স্মৃতির মধ্যে বিশেষ করে আছে বর্ণাশ্রম ধর্মের নিয়ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কি আচার, আবার ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষুর কি কর্তব্য, তাও জানা যায় ঐ শাস্ত্রে।

এখানে একটি মজার কথা বলি, শাস্ত্রে একটি শ্লোক আছে—

জন্মনা জায়তে শূদ্র,

সংস্কারাদ্ দ্বিজোচ্যতে।

বেদপাঠী ভবেদ্ বিপ্রঃ

ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ জন্মায় শূদ্র হয়ে, যখন তার সংস্কার হয় তখনই সে হয় দ্বিজ; ক্রমে সে বেদ পড়তে শিখলে হয় বিপ্র বা তেজস্বী ক্ষত্রিয়; আর ব্রহ্মকে জানতে পেলে তবে হয় ব্রাহ্মণ।

এই শ্লোকটির একটি গূঢ় অর্থ আছে। মানুষ যখন বিড়ালভ করার জন্তে গুরুর কাছে যায়, তখন তাকে শূদ্রের আচরণই করতে হয় গুরুর কাছে। সেই কথা গীতায়ও বলা হয়েছে—

তদ্বিক্রি প্রণিপাতেন

পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ॥

অর্থাৎ সেই বিড়া লাভ করতে হয় প্রণিপাত করে—কিনা নিজের সমস্ত দস্ত পরিত্যাগ করে, সেইসঙ্গে দরকার পরিপ্রশ্ন—কিনা যে কথা গুরুর মুখে শুনে বুঝতে পারছি না, তা আরো ভাল করে নানানভাবে গুরুকে জিগ্যেস করে বুঝে নেওয়া আর শেষ পর্যন্ত সেবা করে, শুধু গুরুকে সেবা করেই নয়, তাঁর কাছে যে বিড়া লাভ করেছি তারি রীতিমত ভাবে সেবন বা চর্চা করে।

এই হলো ব্রহ্মচারীর কর্তব্য। বিচার করে দেখলে বেশ বোঝা যায়, এ হচ্ছে আসলে শূদ্রের কাজ।

ব্রহ্মচারী যখন সমাবর্তন করে গৃহস্থ হয়ে উঠেন বিবাহাদি সংস্কারের ফলে, তখন শূদ্র থেকে তিনি বৈশ্য হয়ে যান। তখন তাঁর প্রয়োজন হয়, পরিবার পালন করার জন্তে কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য করার। বাস্তবিক পক্ষে গৃহী মাত্রেরি বৈশ্য, তাঁরা সর্বত্র খুঁজে বেড়ান কোথায় আরো কি লাভ করা যায়, যার দ্বারা তাঁর আরো বৃদ্ধি ঘটে।

এইভাবে পঞ্চাশ বছর বয়েস পর্যন্ত কাটিয়ে—

পঞ্চাশোদ্ধে বনং ব্রজেৎ ॥ অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর বয়েস পার হলেই বনে যেতে হবে।

এই হলো, বানপ্রস্থ অর্থাৎ বনে গমন করা। মনের অত্যন্ত বলা না থাকলে, কেউ পারেন না প্রৌঢ় বয়সে সাজানো সংসার ত্যাগ করে বনে চলে যেতে। তাই এই অবস্থা শুধু তিনিই লাভ করতে পারেন যার মধ্যে ক্ষাত্রতেজ জেগেছে। তখন তিনি বীর্যবান ক্ষত্রিয়ের মতই দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করে, বেরিয়ে পড়েন নিজ সংসার ছেড়ে। কিন্তু

তিনি তখন শৌর্ষে, তেজে, ধারণাশক্তিতে, নিপুণতায়, যে কোন অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং সে পথ ছেড়ে পালিয়ে যাবার মনোভাব না রেখে, সকলের প্রতি দয়াবান হয়ে, ঈশ্বরের মতই এগোতে থাকেন, আর সর্বক্ষণ বেদের মর্ম বোঝবার চেষ্টা করেন।

এই ক্ষত্রিয়ত্ব থেকেই তিনি ক্রমে উন্নীত হন ব্রাহ্মণপদবীতে, বর্ণাশ্রমে থাকে বলা হয় ভিক্ষু। তখন আর তাঁর দণ্ড-কমণ্ডলু থাকে না, কোন আশ্রয় থাকে না, যদি অবাচিত আহার উপস্থিত হয়, তবেই তা গ্রহণ করেন, না হলে অনশনেই কাটিয়ে দেন। নিশ্চিত ভাবেই তিনি বিশ্বাস করেন যে, জগতের ঈশ্বর তাঁকে ঠিক পথেই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে নাকি যে, একই ব্যক্তি কর্ম ও জ্ঞানের দ্বারা উত্তরোত্তর উন্নত হয়ে ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষু সন্ন্যাসী হয়ে ওঠেন। আর এও বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ ভাবে ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠার যোগ্যতা এক জীবনেই সবাই লাভ করতে পারেন না। গীতায়ও তাই বলা হয়েছে—চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ॥ অর্থাৎ ভগবানই সৃষ্টি করেছেন চার বর্ণের, গুণ ও কর্মে ভিন্নতা অনুসারে। অথচ বর্তমানে দেখি বর্ণ হয়ে উঠেছে বংশগত। কিন্তু সে আবার অশ্রু কথা।

স্মৃতিশাস্ত্রে আর কি আছে?

স্মৃতিশাস্ত্রের কথাই শেষ করি। ঐ শাস্ত্রে যে কেবল আচার-অনুষ্ঠানের কথাই আছে তা নয়, অনাচার করলে কার কি দণ্ড বা সম্পত্তি নিয়ে কোন বিবাদ হলে তার মীমাংসা কি ও কোন উপায়ে, তারও বিশদ বর্ণনা আছে। বর্তমান কালে যে হিন্দু আইন প্রচলিত আছে, তাও মূলত ঐ সব স্মৃতিশাস্ত্র ঘেঁটে তৈরি।

আরো একটি নির্দেশ পাই ঐ স্মৃতিশাস্ত্রে যে, সমাজে ক্রমে সংকর

জাত দেখা দিয়েছিল। আজকে যে আমাদের দেশে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণই নেই, আরো বহু বর্ণের মানুষ আছে, তার কারণ ঐ সংকরজাতি। বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে তাঁদের উৎপত্তি। তার খবর ভাল করে জানা যায় স্মৃতিশাস্ত্র থেকে। অর্থাৎ শাদা কথায়, হাজার বিধিনিষেধ সত্ত্বেও সেকালেও বেশ কিছু যথেষ্টাচার ঘটেছিল, যার ফলে নানা সংকরজাতি দেখা দিল।

স্মৃতজাতির বৈশিষ্ট্য

তখনকার দিনে স্মৃত নামে একটি জাতি ছিল। তাঁদের সঙ্গে মাগধদের নাম মিলিয়ে প্রায় সর্বত্রই স্মৃতমাগধ বলে উল্লেখ করা হতো। মনু বলেন, ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণকন্যা মাতা থেকে স্মৃত জাতির উদ্ভব। তাঁরা সাধারণত রথ চালাতেন, রাজাদের স্তুতি পাঠ করতেন আর পুরাণ পাঠও করতেন। বেদব্যাস তো স্মৃত রোম-হর্ষণকে শিষ্য করে নিয়েছিলেন পুরাণ প্রচারের জন্তে। এই জাতি বাস করতেন অংগ ও মগধ অঞ্চলে। তাকে আবার কীকট দেশও বলা হতো তখন। সেই দেশ বলতে বুঝাতো, কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গার পূর্বাঞ্চলের ভূখণ্ডকেই। সেই অঞ্চলকে আবার ব্যাসকাশীও বলা হতো, যেখানে মানুষ মরলে গাধা হয়ে জন্মাতো, শুধু তাই নয়, সেকালে ঐ পূর্বাঞ্চলে তীর্থভ্রমণ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। অথচ ঐ অঞ্চলেই ছিল রাজা জনকের বাস, আবার স্বয়ং বিশ্বামিত্রও রাম ও লক্ষ্মণকে এনে যে সিদ্ধান্ত্রমে যজ্ঞ করেছিলেন, তাও ছিল অংগদেশে। এতো কথা বলছি এই কারণে যে, পশ্চিমের মানুষরা সেই পুরাকাল থেকেই পূর্বের মানুষদের হীন মনে করতেন। কে জানে, এর মূল কারণ সেই মুনি ও ঋষির বা কর্মী ও জ্ঞানীর আদি বিরোধ কি না?

যাই হোক, স্মৃতদের কথাই বলি। মহাভারতে পাই, কর্ণ স্মৃতপুত্র নামেই পরিচিত ছিলেন। কারণ শৈশবে তিনি স্মৃতবংশের অধিরথের

দ্বারা পালিত হন। তার ফলে যখন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে তিনি লক্ষ্যবেধ করতে উঠলেন তখন দ্রৌপদী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন, সূতপুত্রকে বরণ করবেন না বলে।

এতক্ষণে আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে, সূতজাতি সেকালে কতদূর হীন বলে গণ্য ছিল। অথচ সেই সূতরাই করেছিলেন পুরাণপ্রচার। যে নৈমিষারণ্যে বড়-বড় মুনি ঋষির বৈঠক বসতো, সেখানে সূতরাই আমন্ত্রিত হতেন পুরাণ শোনার জন্তে। সূতরাং প্রশ্ন জাগে, সেই সূতরা সত্যিই কি একেবারে অপাঙ্ক্তেয় ছিলেন? অবশ্য এ কথা সত্যি যে, সূতদের পাঠ শুনে বা বক্তৃতা শুনে দ্রাক্ষী ও বিচক্ষণ মুনিঋষিরা তার যে অর্থ বুঝতেন, সাধারণ মানুষরা তা ধরতে পারতেন না।

উপনিষদের কথা

স্মৃতি ও পুরাণের কথা হলো, এবার উপনিষদের কথা বলি। জৈনদের পুরাণ থেকে যেমন হিন্দু পুরাণ রচিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন, তেমনি তাঁরা বলেন যে, বৌদ্ধদের দর্শন থেকে আদর্শ নিয়ে বহু উপনিষৎ তৈরি হয়েছে। তবে এও তাঁরা স্বীকার করেন যে, বৌদ্ধ-দর্শন আসলে আশ্রয় করে আছে কপিলের সাংখ্য দর্শনকে, সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। এ কথাও সত্যি যে, মুসলমান রাজত্বকালেও আল্লোপনিষৎ নাম দিয়ে মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্তে একখানি উপনিষৎ তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ পুরাণও যেমন আছে প্রাচীন ও অর্বাচীন, উপনিষৎও তেমনি আছে প্রাচীন ও অর্বাচীন। সব থেকে প্রাচীন বলা হয় ঈশোপনিষৎকে, কারণ সেটি হচ্ছে আসলে শুল্ক যজুর্বেদের শেষ অধ্যায়।

পণ্ডিতেরা বলেন, আমাদের দেশে দুশো পঞ্চাশ খানিরও বেশী উপনিষৎ প্রচলিত আছে। কিন্তু আচার্য শংকর তার মধ্যে মাত্র এগারো খানির ব্যাখ্যা করেন। সেগুলি হচ্ছে—ঈশ, কেন, কঠ,

প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও
বৃহদারণ্যক ।

শেষখানি যদিও নামে আরণ্যক কিন্তু উপনিষদের মধ্যেই গণ্য ।
যাই হোক, অনেকেরই বিশ্বাস যে আচার্য শংকর যে এগারোখানি
উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলি প্রাচীন, বাকীগুলি অর্বাচীন ।

বেদের প্রসারে বাধা

কিন্তু এতো কাণ্ড করেও বেদের প্রসার তেমন হলো না । কারণ
সেই আদিকাল থেকে বৈদিক সাহিত্যের পাশাপাশি জেগেছিল জৈন
সাহিত্য, তার পরে আবার বৌদ্ধসাহিত্যও দেখা দিল । সাধারণ
মানুষ ঐ জৈন ও বৌদ্ধধর্মের দিকেই বেশী ঝুঁকলেন । যে সাহিত্যই
হোক তা যদি সবার দ্বারা সেবিত না হয়, তাহলে তার প্রসার
কমে যেতে বাধ্য । বেদের প্রসার আরো কমে গেল শাস্ত্রের কঠোর
অনুশাসনে । সৃষ্টি হলো অধিকার ভেদের ও আধার ভেদের
যুক্তি, অর্থাৎ কোন ছাত্র বেদ পড়বে না পড়বে, তার নানা বিধি-
নিষেধ তৈরি হলো, বিষম বাদ-বিতণ্ডা দেখা দিল বৈদিক আচার্যদের
নিজেদেরই মধ্যে । তার ওপর যারা লিখিত পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন,
তারা সে পুঁথি কাউকে দেখতেও দিতেন না । শিক্ষা দেওয়া হতো
মুখে মুখে । বেশী দিনের কথা নয়, চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালেও
মিথিলায় যেতে হতো শ্রায়শাস্ত্র পাঠ করবার জন্তে । সেখানকার
আচার্য পক্ষধর মিশ্র কাউকে পুঁথি তো দিতেনই না, ছাত্ররা লিখে
নিলেও আপত্তি করতেন । কিন্তু তাঁর ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি
সমস্ত শ্রায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে দেশে ফিরে এলেন, নবদ্বীপে শুরু করে
দিলেন নব্য শ্রায়ের অধ্যাপনা । এমন শ্রুতিধর পণ্ডিত আজো
আছেন, যারা সমগ্র বেদও কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন, অত্যাশ্রয় শাস্ত্র তো
কটেই । কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় ক'জন ? যাক সে কথা ।

বেদ চর্চার প্রসারে আরো বিঘ্ন ঘটলো, বেদের বিভিন্ন শাখা জেগে ওঠায়। তার কথা বলি।

বেদের শাখাভেদ

বেদব্যাস বেদসংকলন করে বিভিন্ন বেদ শেখালেন বিভিন্ন শিষ্যকে। বিষ্ণু পুরাণে পাই, ঋগ্বেদ শেখান তিনি পৈলকে, যজুর্বেদ বৈশম্পায়নকে, সামবেদ জৈমিনিকে আর অথর্ববেদ সুমন্ত মুনিকে। শেষ পর্যন্ত শিষ্যপরম্পরায় সেই চার বেদ বিভক্ত হয়ে গেল নানা শাখায়। তার বিবরণ আছে মুক্তিকোপনিষদে। তাতে দেখি, ঋগ্বেদের একুশটি, যজুর্বেদের একশো নটি, সামবেদের এক হাজারটি এবং অথর্ববেদের পঞ্চাশটি শাখার উল্লেখ। প্রত্যেক শাখায় মন্ত্র-বিশ্বাস বা পাঠক্রম যেমন গেল বদলে, তেমনি প্রায়শই পাঠান্তরও দেখা দিল। অবশ্য বেদের অতগুলি শাখা আজকাল আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বহু পরিশ্রম করে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হুর্গামোহন ভট্টাচার্য মাত্র কয়েক বছর আগে, হারিয়ে যাওয়া পিঙ্গলাদ শাখার অথর্ববেদের একটি পুরো পুঁথি খুঁজে পেয়েছেন উড়িষ্যা প্রদেশের গ্রামাঞ্চল থেকে। সেই পুঁথি ছাপিয়ে বের করা হচ্ছে, কোলকাতার সংস্কৃত কলেজের চেষ্টায়। দুঃখ এই যে, অধ্যাপকমশাই মাত্র একটি কাণ্ডের সম্পাদনা করে যেতে পেরেছেন তাঁর জীবদ্দশায়।

অথর্ববেদের প্রসার

তিনি কিন্তু একটি অপূর্ব তথ্য রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্যে, তাঁর সম্পাদিত ঐ অথর্ববেদের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায়। তিনি খোঁজ পেয়েছেন যে, অথর্ববেদের চর্চা এককালে বহুলভাবে প্রচারিত ছিল নর্মদার উত্তর ও দক্ষিণ কূলে—বিশেষ করে বাংলাদেশে, বিহারে এবং উড়িষ্যায়। আমরা জেনেছি, এই অথর্ববেদ ছিল আদিতে

মুনিপন্থীদের ; স্বয়ং বেদব্যাসও এ বেদ শিখিয়েছিলেন সুমন্ত মুনিকে । তবে কি এইটাই সত্য যে পূর্বাঞ্চলের অংগ, বংগ, ওড়, কলিংগ ও সুন্দা প্রভৃতি দেশ সেই আদিযুগ থেকেই মুনি বা কর্মীদের অধিকারে ছিল ? কিন্তু ও তর্কের কথা থাক ।

বেদের শাখাভেদের ফল

ঐ পিঙ্গলাদ শাখার অথর্ববেদ এতোদিনে আবিষ্কার হওয়ার ফলে এতোকাল যে শোনক শাখার অথর্ববেদ প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে পাঠান্তর বিচার করবার সুযোগ বেশ ভালভাবেই পেয়েছেন পণ্ডিত-জনেরা । কিন্তু ঐ শাখা ভেদের বর্ণনা থেকেই বেশ বোঝা যায় যে, বিভিন্ন আচার্য কি ভাবে বেদের মন্ত্রকে নিজের মত করে তুলেছিলেন, হয়তো শুনে শেখার ফলেই এমন কাণ্ড ঘটেছিল । কিন্তু তার ফলে বেদমন্ত্র যে আরো দুর্বোধ্য হয়ে উঠলো দিনে দিনে, একথা না বললেও চলে ।

বেদশিক্ষার বিপর্যয়

শেষ পর্যন্ত তাই নানা স্মৃতি ও পুরাণের সাহায্যে বেদকে সুরক্ষিত করবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল । এ বেশ মজার কথা যে, যে বেদ ছিল মূল, তাকে প্রচার ও প্রসার করবার জন্তে দরকার হয়ে উঠলো নানা ব্যাখ্যার, বিধানের ও গল্পের । ফল হলো এই যে, মূল বেদ নিয়ে চর্চা আর কেউ বড় করতেন না, শাখা-প্রশাখা নিয়েই মেতে উঠলেন সবাই, বর্তমান যুগে যেমন আমরা সবাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য আশ্বাদন করি, বিভিন্ন ভাষ্যকারের রচনা পড়ে ।

এই ভাবে দিনে দিনে, বেদের কর্মকাণ্ডের পথকে আড়াল করে দেখা দিল জ্ঞানকাণ্ডের প্রাচীর, বড় হয়ে উঠলো ভাববাদ । সেই ভাবকে আরো বড় করে তুলে ধরা হলো পুরাণের গল্পের মাধ্যমে । ক্রমে সেই ভাবই জাগিয়ে তুললো মানুষের মনে ভক্তি ।

অত্মদিকে আবার যাঁরা উপনিষৎ নিয়ে মেতে উঠলেন তাঁরা বের করলেন জ্ঞানের পথ। কারণ উপনিষৎ নিয়ে যাঁরা রইলেন, তাঁরা হলেন অসাধারণ বিদ্বানের দল। অর্থাৎ সাধারণ অবিদ্বানরা ভক্তিকে ধরে, আর অসাধারণ বিদ্বানরা জ্ঞানকে ধরে বেদের যে কর্মের চর্চা তা থেকে বেশ সরে এলেন।

বেদ ও তন্ত্র

ইতিমধ্যে আবার তন্ত্রগুলি জেগে উঠলো। শোনা যায়, সর্বসমেত একশো বিরানব্বইখানি তন্ত্র আছে, তার মধ্যে চৌষট্টিখানি অশ্বক্রান্তা বিভাগে, চৌষট্টিখানি রথক্রান্তা বিভাগে আর চৌষট্টিখানি বিষ্ণুক্রান্তা বিভাগে প্রচলিত, নাম যদিও তাদের সবগুলির একই। পৃথিবীর এই ক্রান্তা বিভাগ সম্বন্ধে শক্তিমঙ্গল তন্ত্রে পাই যে, বিদ্ব্য পর্বত থেকে পূর্বদিকে জাভা পর্যন্ত সব দেশের নাম বিষ্ণুক্রান্তা। (বিষ্ণু শব্দের এক অর্থ হচ্ছে বায়ুচালিত পোত, সেই পোত সাহায্যে ঐ সব দেশ অতিক্রম করা যেত বলেই মনে হয়।) উত্তরে মহাচীন পর্যন্ত সব দেশের নাম রথক্রান্তা। (ভারতবর্ষ থেকে যে চীন পর্যন্ত যাবার প্রশস্ত পথ ছিল, তার নিদর্শন বের হয়েছে ব্রহ্মদেশের উত্তর অঞ্চলে, গত মহাযুদ্ধের সময়, সেই পথে রথও চলতো।) আর পশ্চিমে পারস্য, মিশর ও রোডেশিয়া প্রভৃতি সব দেশ ছিল অশ্বক্রান্তা। আমরা জানি, উত্তরপশ্চিম সীমান্তে খাইবার ও বোলান গিরিপথ আছে। ভারতবর্ষে তাই গ্রীকরাও ঐ পথে অশ্বারোহণে এসেছিলেন। কিন্তু সে কথা এই পর্যন্ত থাক।

তন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বৌদ্ধ তন্ত্রকে অনুসরণ করেই হিন্দুতন্ত্রের সৃষ্টি। যাই হোক, তন্ত্র কিন্তু বেদের মন্ত্র সম্বন্ধে বিষম কথা প্রচার করতে লাগলেন।

তাই পাই—

নির্বীৰ্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া

বিষহীনোরগা ইব।

সত্যাদৌ সফলা আসন্

কলৌ তে মৃতকা ইব ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র ॥ ২।১৫ ॥

—বিবহীন সাপের যা অবস্থা তেমনি অবস্থা হয়েছে বৈদিক মন্ত্রগুলির, একেবারে বীৰ্বহীন হয়ে যাওয়ায়। অবশ্য সত্য প্রভৃতি যুগে সে মন্ত্র সফল ছিল, কিন্তু কলিতে একেবারে মৃততুল্য।

অথচ তান্ত্রিকরা যে সাতটি আচার পালন করেন, তার প্রথমটি হচ্ছে বেদাচার। তবু যে কেন তন্ত্রে বেদমন্ত্র সম্বন্ধে অমন কথা বলা হয়েছে, তা ভেবে দেখার। মনে হয়, তন্ত্রের নতুন মতকে সবার কাছে বড় করে তোলবার চেষ্টাতেই অমন কথা উঠেছিল। তাছাড়া এও হয়তো একটি কারণ যে, যখন তন্ত্রের যুগ এলো, তখন বেদমন্ত্রের সম্বন্ধে অনেকেরি ধারণা বেশ স্বচ্ছ ছিল না।

বেদাংগের উদ্ভব

ধারণা যে অস্বচ্ছ হয়েছিল, তার প্রমাণ হচ্ছে বেদাংগগুলি। অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেবের সময় থেকেই বেদমন্ত্রকে ভাল করে বুঝে নেবার জন্মেই বেদাংগগুলি তৈরি হয়। তবে আচার্য পানিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের শিক্ষা অধ্যায়ে যে শ্লোকটি পাই, তার থেকে মনে হয় যে, বুদ্ধদেবের জন্মের আগে থেকেই বেদাংগগুলি সৃষ্টি হয়। কারণ স্বয়ং পানিনিই তো বুদ্ধদেবের সমসাময়িক, তিনি তখনি বেদের ছটি অংগের নাম করেছেন। তাঁর শ্লোকটি এই—

ছন্দঃ পাদৌ তু বেদশ্চ

হস্তৌ কল্লোহথ পঠ্যতে ।

জ্যোতিষাময়ং চক্ষুর্

নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে ॥

শিক্ষা ভ্রাণং তু বেদশ্চ

মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্ ।

—ছন্দহইছে বেদের পা, কল্প হচ্ছে হাত, জ্যোতিষ হচ্ছে চক্ষু, নিরুক্ত কান, শিক্ষা নাসিকা আর মুখ ব্যাকরণ, এই ছটি অংগ জেনে যিনি বেদ পাঠ করেন, তিনি লাভ করেন ব্রহ্মলোক। এখানে ব্রহ্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে মন্ত্র। তিনি ষড়ংগযুক্ত বেদ চর্চা করেন, তিনি মন্ত্র সম্বন্ধে সমধিক জ্ঞানী হয়ে ওঠেন, এই হচ্ছে বক্তব্য।

বেদাংগ—ছন্দঃ

এবার ঐ ছ'টি অঙ্গের কথা কিছু কিছু বলি।

প্রথম অংগ হচ্ছে ছন্দঃ। বৈদিক ছন্দঃ শিখতে হলে বর্তমানে একমাত্র বই হচ্ছে, আচার্য পিংগলের ছন্দঃসূত্র। আচার্য পিংগল আবার মুনি নামেও পরিচিত। তার আগে আরো কেউ ছন্দোবিদ ছিলেন কিনা তা বলা কঠিন, কারণ কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অনেকে মনে করেন যে, নাট্যাচার্য ভরত মুনি তাঁর রচিত 'নাট্যশাস্ত্রে' যে সব ছন্দের উল্লেখ করেছেন, তার রীতি পিংগলের থেকেও প্রাচীন। যদিও ভরত মুনি বৈদিক ছন্দঃ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন খবর দেন। যাক সে কথা।

বেদে মূলতঃ পাওয়া যায় সাতটি ছন্দঃ। তাদের নাম হচ্ছে, গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী।

গায়ত্রী ছন্দে তিনটি পাদ। প্রত্যেক পাদে আটটি অক্ষর অর্থাৎ সর্বসমেত চব্বিশটি অক্ষর এই ছন্দে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

অ গ আ যা হি বী ত য়ে

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

গৃণা নো হ ব্য দা ত য়ে

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

নি হো তা সৎ সি ব হিঁ য়ি ॥

সা—১।১।১॥

উষ্ণিক ছন্দে তিনটি পাদ। কিন্তু একটি পাদে চারটি অক্ষর
বেশী থাকে, তাই সর্বসমেত আটটি অক্ষর এই ছন্দে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬	৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ই ষে ভা উ র্জে ভা	বা য় ব স্থ দে বো
১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭ ৮
বঃ স বি তা	প্রা র্ণ য় তু
১ ২ ৩ ৪ ৫	৬ ৭ ৮
শ্রে ষ্ঠ ত মা য়	ক র্ম ণে ॥

য—১।১॥

এ মন্ত্রে প্রথম দুটি শব্দের সন্ধি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠপ্ ছন্দে চারটি পাদ। প্রত্যেক পাদে আটটি অক্ষর,
তাই সর্বসমেত বত্রিশটি অক্ষর এই ছন্দে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ৫	৬ ৭ ৮
মা যা ভি রি দ্র	মা য়ি নং
১ ২	৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
জং	শু ষ ম বা তি র।
১ ২ ৩	৪ ৫ ৬ ৭ ৮
বি ছ ষ্টে	ত স্ত্র মে ধি রা,
১ ২	৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
তে যাং	শ্র বা স্ম্য ত্তি র ॥

যা—১।১১।৭।৮॥

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের ‘জং’ ও চতুর্থ পাদের ‘স্ম্য’, এই অক্ষর
দুটিকে ইয়াদিপূরণ করে নিয়ে উচ্চারণ করতে হবে অর্থাৎ পড়তে
হবে তুজং ও সিউ। তাহলেই অক্ষর সংখ্যা ঠিক হবে, অন্যথা কম
হবে। বলে রাখি, বেদের বহু মন্ত্রেই এই ভাবে অন্তঃস্থ ব-কে উঅঃ
এবং অন্তঃস্থ য-কে ইঅ উচ্চারণ করলে তবে অক্ষর সাম্য থাকে।

বৃহত্তী ছন্দে চারটি পাদ। তার একটি পাদে চারটি অক্ষর বেশী থাকে, তাই সর্বসমেত ছত্রিশটি অক্ষর এই ছন্দে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮
ও কি বাং সা	সু তে	স চাঁ
১ ২	৩ ৪	৫ ৬ ৭ ৮
অ স্বা	স প্তী	ই বা দ নে ॥
১ ২ ৩ ৪ ৫	৬ ৭ ৮ ৯	১০ ১১ ১২'
ই দ্রা ষ গ্নী	অ ব সে হ	ব জি গা
১ ২	৩ ৪	৫ ৬ ৭ ৮
ব য়	দে বা	হ বা ম হে ॥

স্বা—৬।৫৯।৩।

এই মন্ত্রের তৃতীয় পাদে 'স্ব' অক্ষরটিকে ইয়াদিপূরণ করে 'হুঅ' উচ্চারণ করা দরকার, অক্ষর গণনা সেই ভাবে দেখানো হয়েছে।

পংক্তি ছন্দে পাঁচটি পাদ। প্রত্যেক পাদে আটটি অক্ষর, তাই সর্বসমেত চল্লিশটি অক্ষর এই ছন্দে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮
আ তে অ গ্ন	স্বা চা	হ বিঃ
১ ২ ৩	৪ ৫ ৬	৭ ৮
শু ক্র স্ম	শো চি ষ স্প	তে।
১ ২ ৩	৪ ৫ ৬	৭ ৮
সু শ্চ ল্লে	দ স্ম	বি শ্ প তে
১ ২ ৩	৪ ৫	৬ ৭ ৮
হব্যবাট্	তু ত্যাং	হু য় ত
১ ২ ৩ ৪ ৫	৬ ৭ ৮	
ই ষং	স্তো তৃ ভ্য	আ ভ র ॥

স্বা—৫।৬।৫।

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে চারটি পাদ। প্রত্যেক পাদে এগারটি অক্ষর, তাই
সর্বসমেত চুয়াল্লিশটি অক্ষর এই ছন্দে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭	৮ ৯ ১০ ১১
অ হ ন হিং	প ব তে	শি শ্রি যা ণং
১ ২ ৩	৪ ৫	৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
ত্ব ষ্টা ষ্মৈ	ব জ্ঞং	শ্ব র্যং ত ত ক্ষ।
১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭	৮ ৯ ১০ ১১
বা শ্রা ই ব	ধে ন বঃ	শ্র ন্দ মা না
১ ২	৩ ৪ ৫ ৬ ৭	৮ ৯ ১০ ১১
অ ঙ্গঃ	স মু জ় ম ব	জ গু রা পঃ ॥

ঋ—১।৩২।২॥

এই মন্ত্রে দ্বিতীয় পাদে ‘শ্বর্যং’ শব্দটি, ইয়াদিপূরণ করে ‘শ্বরিত্যং’
পড়তে হবে।

জগতী ছন্দে চারটি পাদ। প্রত্যেক পাদে বারোটি করে অক্ষর,
তাই সর্বসমেত আটচাল্লিশটি অক্ষর এই ছন্দে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭	৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ত্ব ম গ্ণে	প্র থ মো	অং গি র স্ত মঃ
১ ২ ৩ ৪ ৫	৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২	
ক বি র্দ্দে বা নাং	প রি ভূ ষ সি	ত্র ত ম্।
১ ২ ৩ ৪ ৫	৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২	
বি ভু বি শ্ব ষ্মৈ	ভূ ব না য়	মে ধি রো
১ ২ ৩ ৪ ৫	৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২	
দ্বি মা তা শ য়ঃ	ক তি ধা	চি দা য় বে ॥

ঋ—১।৩১।২॥

এই মন্ত্রে প্রথম অক্ষর ‘ত্ব’-কে ইয়াদিপূরণ করে ‘তুঅ’ পড়তে
হবে।

এই সাতটি ছন্দের মধ্যে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করবার আছে যে, গায়ত্রী থেকে প্রত্যেকটি পরবর্তী ছন্দে চারটি করে অক্ষর বাড়তে বাড়তে জগতী-তে ঠিক গায়ত্রীর দ্বিগুণ অক্ষর সংখ্যা হয়েছে। আর লক্ষ্য করবার যে, প্রত্যেক ছন্দে কেমন বিচিত্র ধ্বনিতরংগ জেগেছে।

বেদমন্ত্রে অবশ্য এই সাতটি ছাড়া আরো চৌদ্দটি মিশ্র ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ঐ মূল সাতটি ছন্দকে আয়ত্ত করতে পারলে, বাকীগুলিকে আয়ত্তে আনতে দেরি হয় না। এখানে বলাই বাহুল্য যে, রীতিমত চর্চা না করলে বৈদিক ছন্দগুলি আয়ত্তে আনা অসম্ভব।

আচার্য পিংগল তাঁর ছন্দঃসূত্রে প্রত্যেক ছন্দের দেবতা, স্বর, বর্ণ বা রঙ, ও গোত্র সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা হচ্ছে এই—

ছন্দ	দেবতা	স্বর	বর্ণ	গোত্র
গায়ত্রী	অগ্নি	ষড়্জ	সিত	অগ্নিবংশ
উষ্ণিক	সবিতা	ঋষভ	সারংগ	কাশ্যপ
অনুষ্টুপ্	সোম	গান্ধার	পিণ্ড	গৌতম
বহতী	বৃহস্পতি	মধ্যম	কৃষ্ণ	আংগিরস
পাক্তি	মিত্রা- বরুণ	পঞ্চম	নীল	ভার্গব
ত্রিষ্টুপ্	ইন্দ্র			
জগতী	বিশ্ব- দেবগণ	ধৈবত নিষাদ	লোহিত গৌর	কৌশিক বশিষ্ঠ

কিন্তু আজো আমাদের দেশে দ্বিজগণ যে আত্মিকমন্ত্র নিত্য পাঠ করেন তাতে দেখি, উষ্ণিক থেকে পাক্তিছন্দ পর্যন্ত দেবতার নাম যথাক্রমে হচ্ছে—বায়ু, সূর্য, বরুণ ও বৃহস্পতি। আবার ঋষি নাম

বা গোত্রও গায়ত্রী থেকে যথাক্রমে হচ্ছে—বিশ্বামিত্র, ভৃগু, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, গৌতম, কাশ্যপ ও আংগিরস। এর থেকে বেশ বোঝা যায় নাকি যে, এ সম্বন্ধেও কেমন ও কতখানি মতান্তর ছিল।

বেদাংগকল্প

এবার বেদের দ্বিতীয় অংগ, কল্প সম্বন্ধে কিছু বলি। যজ্ঞের বিধিনিষেধ সংক্ষেপে সূত্র-আকারে নিহিত হয়ে আছে এর মধ্যে। এই কল্পের চারিটি ভাগ, যথা—শ্রোতসূত্র, গৃহসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুদ্ধসূত্র। ভিন্ন ভিন্ন মুনির নামে সেই সূত্রগ্রন্থগুলি প্রচলিত।

শ্রোতসূত্রে আছে ঋতি বা বেদ অনুযায়ী যজ্ঞের বা কিছু নির্দেশ। গৃহসূত্রে আছে, গৃহস্থ মানুষের বা কিছু কর্তব্য, তারি কথা। ধর্মসূত্র হচ্ছে, গৃহসূত্রের পরিপূরক। আর শুদ্ধসূত্রে আছে, যজ্ঞ বেদী ও ক্ষেত্রাদির নানা মাপজোখের কথা। বর্তমানে আমরা যে জ্যামিতি পাঠ করি, শুদ্ধসূত্রই হচ্ছে তার আদিকল্প। তখন ইউ-ক্লিড বা টলেমী কোথায় ?

বেদাংগ-জ্যোতিষ

বেদের তৃতীয় অংগ হচ্ছে জ্যোতিষ। যজ্ঞ করবার কালনির্ণয় করবার জন্মে সেই পুরাকাল থেকেই এর চর্চা হতো। সেই কালের কিছু পুঁথিও এ বিষয়ে পাওয়া যায়। তারপর এই শাস্ত্রের বহু বিখ্যাত আচার্য্যই এদেশে জন্মেছেন, যেমন ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, বরাহমিহির ইত্যাদি। ইউরোপের জ্যোতির্বিদরাও স্বীকার করেন যে, অয়নচলনের যে সিদ্ধান্ত আছে হিন্দু জ্যোতিষে, তা নির্ভুল। একটা কথা, এই জ্যোতিষের সঙ্গে গণিত শাস্ত্রের যোগ কিন্তু অবিচ্ছেদ্য। অনেকে আবার মনে করেন যে, সংখ্যার প্রথম আবিষ্কার করেন সাংখ্য দর্শনের রচয়িতা কপিল মুনি।

বেদাংগ—নিরুক্ত

বেদের চতুর্থ অংগ হচ্ছে, নিরুক্ত। আচার্য যাস্কের প্রণীত নিরুক্তই আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু তিনি নাম করে গিয়েছেন তাঁর পূর্ববর্তী আরো সতের জন নিরুক্তকারের। অবশ্য তাঁদের কোন পুঁথি আজো পাওয়া যায় নি। নিরুক্তের মধ্যে আছে, প্রত্যেকটি বৈদিক শব্দ কি প্রকারে জেগেছে, কোন মূল ধাতু থেকে, তারি বিচার ও বিশ্লেষণের চেষ্টা। আরো একটি বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন আচার্য যাস্ক যে, প্রত্যেকটি বেদমন্ত্রের চারটি করে অর্থ হয়, যথা, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিযাত্তিক। অর্থাৎ প্রত্যেক মন্ত্রই প্রথমতঃ সাহায্য করে আমাদের দেহের বিস্তারের যার নাম আধিভৌতিক, দ্বিতীয়তঃ প্রাণের বিস্তারের যার নাম আধিদৈবিক, তৃতীয়তঃ মনের বিস্তারের যার নাম আধ্যাত্মিক ও চতুর্থতঃ সমস্ত সমাজের বিস্তারের, যার নাম আধিযাত্তিক।

এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বেদমন্ত্রের নিশ্চিত ব্যাখ্যা সেই যাস্কের যুগেও আর কারো জানা ছিল না, তাই যিনি যত বড় জ্ঞানী বা যেটুকু বিত্তার অধিকারী, তিনি সেই মত ব্যাখ্যা করছিলেন। শেষে আচার্য যাস্কই সবার মতের সমন্বয় করার চেষ্টা করেন বলেই, তাঁর নিরুক্ত খানি আজো টিকে আছে।

বেদাংগ শিক্ষা

বেদের পঞ্চম অংগ হচ্ছে শিক্ষা। এই শিক্ষার থেকে জানা যায় বর্ণ কতগুলি, তাদের জাতি কি এবং কি ভাবে সেগুলি উচ্চারণ করতে হয়। বর্তমানে আচার্য পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের মধ্যেই এই শিক্ষা সম্বন্ধে একটি অধ্যায় পাওয়া যায়। তাতে দেখি, আরো দুজন আচার্যের নাম, তাঁরা হচ্ছেন শম্ভু ও স্বয়ম্ভু। তাঁদের মতে স্বর ও ব্যঞ্জন মিলিয়ে সর্বসমেত তেঁষট্টি বা চৌষট্টি বর্ণ আছে।

হোক, সেই বর্ণ উচ্চারণের সম্বন্ধে বহু বিধিনিষেধ আছে ঐ পাণিনীয় শিক্ষাঅধ্যায়ে। এই শিক্ষা সম্বন্ধে বেশ কিছু উপদেশ পাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে ও ছান্দোগ্য উপনিষদে। কিন্তু উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন য়ারা, তাঁরা উপনিষদের প্রত্যেকটি শব্দ থেকে জাগিয়ে তুলেছেন ভাববাদ। তাই তার প্রকৃত তথ্য সবই ডুবে গিয়েছে তত্ত্বের সমুদ্রে।

এই শিক্ষার মধ্যে থেকেই জানতে পাই, অনুদাত্ত, উদাত্ত ও স্বরিত্ত বা উদারা-মুদারা ও তারা গ্রামের স্বরের কথা, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও শ্লুত অর্থাৎ এক, দুই ও তিন মাত্রার কথাও।

বেদাংগ ব্যাকরণ

বেদের ষষ্ঠ অংগ হচ্ছে, ব্যাকরণ। বৈদিক যুগের ব্যাকরণ কেমন ছিল, তা ঠিক জানা যায় না, আচার্য পাণিনির ব্যাকরণই আমাদের সম্বল। কিন্তু পণ্ডিতজন মনে করেন যে, পাণিনির ব্যাকরণ আদৌ বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ নয়, সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ। তাঁরা বলেন, প্রাচীন বৈদিক ভাষার সংস্কার করেই সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি। এ বিষয়ে অবশ্য অন্তিমতও আছে। যাই হোক, বর্তমানে বেদমন্ত্রের অর্থ করতে এই পাণিনির ব্যাকরণ হচ্ছে একমাত্র উপায়। বেদের প্রথম ভাষ্যকার আচার্য সায়ণও তাই এই পাণিনির সাহায্য নিয়েই অগ্রসর হয়েছেন।

কিন্তু পাণিনি তো তাঁর পূর্ববর্তী দুজন আচার্যের নাম করেছেন ঐ শব্দ ও স্বয়ম্ভু, যাদের কথা আগেই বলেছি। শোনা যায় পাণিনির ব্যাকরণ প্রচারিত হবার আগে, মাহেশ ব্যাকরণ নামে একখানি ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল। সেই মাহেশ ও পাণিনির উল্লিখিত শব্দ হয়তো একই ব্যক্তি। তবে মাহেশ যে গায়ত্রী মন্ত্রের প্রথম বক্তা, এ কথা জানা যায় গায়ত্রীর জপসমর্পণ বা বিসর্জন মন্ত্রে। তাতে গায়ত্রীকে বলা হয়েছে—

মহেশবদনোৎপত্তা ॥ অর্থাৎ মহেশের মুখ থেকে উৎপন্ন ।

ব্যাকরণ শব্দের গুট ব্যাখ্যাও হচ্ছে, মুখ থেকে উৎপন্ন শব্দ ।
আবার ব্যাকরণকেই বলা হয় বেদের মুখ । তাই বেশ মনে হয় যে, মহেশ ছিলেন প্রথম ব্যাকরণকৃৎ । সেই কথা স্মরণ করার জন্তই ঐ মন্ত্রটি আত্মিককৃত্যে নিহিত করা হয়েছে । আর ঐ গায়ত্রীকে বলা হয় বেদমাতা, আসলে গায়ত্রী হচ্ছে বাক্য উচ্চারণের শক্তি । সেই শক্তিকে সম্যকভাবে জাগাতে না পেলে, কে আর পারবে বেদ আয়ত্ত করতে—এই হচ্ছে উপনয়নের গায়ত্রী বা সাবিত্রী দীক্ষার রহস্য ।

শোনা যায়, পাণিনিও মহেশ্বরের তপস্যা করেই ব্যাকরণ আয়ত্ত করেছিলেন । পাণিনীয় ব্যাকরণে সে কথার উল্লেখ আছে, আর সেই সঙ্গে বাক্যকার বররুচি এবং ভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনিরও নাম পাওয়া যায় তাতে । পরে আরো বহুজন তাঁদের সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছেন ।

সূত্রাকারে বেদাঙ্গ রচনার ফল

একটি কথা, বেদাঙ্গগুলির প্রায় সব ক'টিই, সূত্রাকারে অর্থাৎ অত্যন্ত সংক্ষেপে রচনা করেছিলেন যারা, তাঁরা সবাই মুনি বা আচার্য নামে খ্যাত । সূত্রগুলি এতো অল্পকথায় গাঁথা যে, সেগুলি প্রকৃত পক্ষে বেদমন্ত্রের থেকেও ছুঁরুহ হয়ে উঠেছে । তাই সেই সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করবার জন্তে প্রয়োজন হলো বিভিন্ন পণ্ডিতজনের, তৈরি হলো বিভিন্ন ভাষ্য, মহাভাষ্য ও বার্তিক । সে যে কি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হলো তা বলবার নয় । যে বেদাঙ্গগুলির উদ্দেশ্য ছিল বেদকে বুঝে নেবার বিষয়ে সাহায্য দেবার, সেই বেদাঙ্গগুলিই হয়ে উঠলো এক একটি বিশাল শাস্ত্র । সে কেমন হলো তার বেশ একটি বর্ণনা আছে আচার্য সায়ণের ঋগ্বেদ ভাষ্যভূমিকায় ।

ইন্দ্র গেলেন দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে ব্যাকরণ শিখতে। সেই এক ব্যাকরণ শিখতেই ইন্দ্রের সময় লাগল দিব্য সহস্র বৎসর। সে কত বৎসর? সাধারণতঃ আমাদের ছটি মাসে হয় দেবলোকের একদিন বা এক রাত্রি, অর্থাৎ আমাদের অনুপাতে তিন লক্ষ ষাট হাজার বৎসর সময় লেগে গেল ইন্দ্রের মত সর্বশক্তিমান দেবতার। এর থেকে বেশ বোঝা যায় নাকি যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রই কি প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছিল? এবং সূত্রাকারে বেদাঙ্গ রচনারই বা কি ফল হয়েছিল?

ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রচর্চা

ক্রমশঃ বৈয়াকরণিক নামে এক স্বতন্ত্র পণ্ডিতসম্প্রদায় জেগে উঠেছিলেন। মনে পড়ে যায় বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত ডি:এল. রায় তাঁর রচিত ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে যে কাভ্যায়ন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তার কথা। সেই কাভ্যায়ন অসাধারণ ব্যাকরণবিদ ছিলেন, শেষ পর্যন্ত পাণিনির সূত্র প্রয়োগ করে তিনি সবকিছুর ব্যাখ্যা করতেন বলে প্রবাদ। তাই কুটনীতিজ্ঞ মহাপণ্ডিত চাণক্যের কাছে তিনি কেবলি ধমক খেয়ে, বেশ যেন হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছেন ঐ নাটকে। কিন্তু কাভ্যায়নের পাণ্ডিত্য ছিল সত্যিই অগাধ।

যাই হোক, বেদের বিভিন্ন অংগের চর্চা নিয়ে বিভিন্ন বিদ্বান ব্যাপৃত হলেন—কেউ ছান্দসিক, কেউ কল্পসূত্রাদিবিদ, কেউ জ্যোতির্বিদ হয়ে উঠলেন কালে কালে। সমগ্র বেদ নিয়ে চর্চা তাই বেশ ব্যাহত হলো।

বেদাদি ব্যাখ্যায় যুক্তির প্রয়োগ

আবার ঐ পুরাণের মধ্যেও বা মহাকাব্য দুটির মধ্যেও তো দেখি, ওই আদি বেদমন্ত্ৰেরই ব্যাখ্যা করবার নানা চেষ্টা। কিন্তু যত

বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ভাবে সেই চেষ্টা চললো, ততই সৃষ্টি হলো জটিলতার। তাই মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে শুনি—

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ

নাসৌ মুনির্ষশ্চ মতং ন ভিন্নং ॥

—চার বেদ চার রকম, যতগুলি স্মৃতি সবই আলাদা কথা বলে, এমন মুনি নেই যিনি অস্ত্রের সঙ্গে একমত। কে জানে, সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত বেদব্যাসের পুত্রের মুখ দিয়ে ভাগবতে হৃদয়বাদকে ভিত্তি করে ভক্তির মতকে আরো বড় করে তোলা হয়েছিল কিনা। সেই ভক্তির মূল কথা হচ্ছে, ইষ্ট বা অভীষ্ট, যার সাধারণ ব্যাখ্যা হচ্ছে মনের সাধ, তাকেই একান্তভাবে আঁকড়ে থাকা

ব্যাখ্যার অরণ্যে কিভাবে যে সবাই সেদিন বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তার উজ্জল প্রমাণ হচ্ছে এই প্রবাদটি—পুরাণমিত্যেব ন সাধুঃ সর্বম্ ॥—পুরাণ মাত্রেই খাঁটি নয়।

তাহলে কিসের জোরে আমরা এগিয়ে যাব? এ সম্বন্ধে চমৎকার একটি প্রবচনের উল্লেখ করেছেন আচার্য কুল্লুক ভট্ট, তাঁর তৈরি মনুসংহিতার টীকায়। সেটি এই—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য

ন কৰ্তব্যং বিনির্ণয়ং

যুক্তিহীনে বিচারে তু

ধর্মহানি প্রজায়তে ॥

—কেবল শাস্ত্র মেনে কোন কিছুর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়। যুক্তির সাহায্যে বিচার করে সিদ্ধান্ত করা উচিত, তা না হলে ধর্মহানি ঘটে।

মতান্তরের ফল

বাস্তবিক বিচারকে প্রয়োগ করতে হয় যুক্তির সাহায্যে, তা না হলে তো বিচার কোনই ফল দেখা দেয় না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে

এই যে, সকলের বোধ তো সমান নয়, তাই বুদ্ধিও সমান ওজনের নয় সবার—সামর্থ্যের তারতম্যেও যে বিচারে বিরোধ হয়! এর প্রতিরোধ কোথায়? এর প্রতিরোধ বোধ হয় সম্ভব নয়। তাই বেদের ব্যাখ্যা নিয়ে দিনে দিনে নানা মত জেগে উঠলো। তার ফলে কিন্তু একটি উপকার হয়েছে। সেই মতান্তরের ফলে প্রত্যেকে তাঁর স্বাধীন মতকে স্থাপন করে যেতে পেরেছেন। অবশ্য তারই জন্তে দেখা দিয়েছে নানা সম্প্রদায়, কিন্তু মানুষের জ্ঞানকে সর্বদিক থেকে বিকশিত করে তোলার একটি অপূর্ব সুযোগও দেখা দিয়েছে এতে। তাই না রচিত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন শাস্ত্রাদি, এমন কি উপবেদগুলিও।

উপবেদ কি কি

উপবেদগুলির কথাও বলি। চার বেদের চারখানি উপবেদ আছে যেমন, ঋগ্বেদের উপবেদ হচ্ছে স্থাপত্য বেদ, যজুর্বেদের উপবেদ ধনুর্বেদ, সামবেদের উপবেদ গান্ধর্ববেদ আর অথর্ববেদের উপবেদ আয়ুর্বেদ। স্থাপত্যবেদে পাই গৃহ, প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণের কলাকৌশল, ধনুর্বেদে পাই যুদ্ধের যা কিছু নিয়ম, গান্ধর্ববেদে পাই নৃত্যগীত ও বাজের যা কিছু শিক্ষা আর আয়ুর্বেদে পাই রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিধিনিষেধ।

পঞ্চম বেদ—নাট্যবেদ

এই সব উপবেদের চেয়েও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, নাট্য নামে পঞ্চম বেদ। ভরত মুনি ছিলেন সেকালের নাট্যাচার্য। তাঁর নামে প্রচলিত নাট্যশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, ঋগ্বেদ থেকে আয়ুর্ভি, যজুর্বেদ থেকে নৃত্য, সামবেদ থেকে গান ও অথর্ববেদ থেকে রস সংগ্রহ করে লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই নাট্যবেদ সৃষ্টি

করেন লোকশিক্ষার জন্তে, বিশেষ করে সেইসব লোক যাদের বেদে অধিকার নেই তাদের শিক্ষার জন্তেই নাট্যবেদের উদ্ভাবনা।

ভরত মুনির ছিল একশো ছেলে। ব্রহ্মা তাই, তাঁকেই নাট্য-প্রয়োগের ভার দিলেন। জম্বীকায় অভিনয় করার জন্তে ভরত মুনি যখন কিছু নারীর প্রয়োজন জানালেন, ব্রহ্মার নির্দেশে বিশ্বকর্মা তৈরি করে দিলেন একশো অপ্সরা। নাট্যবেদের অসীম শক্তি ও প্রভাব বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত কত পণ্ডিত যে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তারা জানেন।

দিনে দিনে মূল বেদ হয়ে গেল গভীরতর শ্রেণীগত চর্চার বস্তু। ক্রমে কাব্য ও অলংকার শাস্ত্রের যুগ এসে বেদের চর্চা আরো খণ্ডিত করে দিলো।

কাব্য ও অলংকারশাস্ত্র

বেদচর্চা ও বিস্তার কিভাবে কাব্যের দ্বারা ব্যাহত হলো, তা বুঝতে গেলে, কাব্য কি তা বোঝা দরকার। এই কাব্য কিভাবে বিচার করতে হয়, তার নির্দেশ পাই অলংকার শাস্ত্রে। তাতে বলা হয়েছে : বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্॥—রসই যার আত্মস্বরূপ, সেই সব বাক্যকে কাব্য বলে।

রসের সৃষ্টি করাই ছিল বা এখনো আছে, কাব্যের উদ্দেশ্য। রসগুলি হচ্ছে : আদি বা শৃংগার, হাস্য, করুণ, রোদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত, এই আটটি। তার সঙ্গে আবার শান্ত ও বৎসল এই দুটি যোগ করে, সর্বসমেত দশটি রস ধরা হয়। যিনি যত বড় কবি, তিনি তাঁর কাব্যে তত সুন্দরভাবে ঐ রসগুলি সৃষ্টি করতে পারেন। কাব্য আবার ছ'রকমের হয়, যেমন শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। যা কেবল পড়ে আনন্দ পাবার বা শুনিয়ে আনন্দ পাবার, তাই হচ্ছে শ্রব্যকাব্য, আর যা শুধু পড়াশোনারই নয়, অভিনয় করে পাঁচজনকে দেখাবার, তার নাম দৃশ্যকাব্য বা নাটক।

এই কাব্যকে সেকালে পণ্ডিতজনেরা কি চক্ষে দেখতেন, তার কথা কিছু বলি। তাঁরা বলতেন—চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ মুখাদল্লাধয়ামপি ॥ —এই কাব্য যদি অল্পবুদ্ধি লোকের মুখ থেকেও শোনা যায়, তাতেও শ্রোতার ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গফল লাভ হয়। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছেঃ শব্দমূর্তিধরশ্রুতে বিষ্ণোরংশা মহামুখা ॥ —এই কাব্য হচ্ছে মহাত্মা শব্দমূর্তিধর বিষ্ণুর অংশস্বরূপ। নাট্যাচার্য ভরত মুনি তো এই কাব্যরস আশ্বাদনকে বলেছেন; ব্রহ্মস্বাদ সহোদর।

কবি ও কবিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব

এই প্রসঙ্গে কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে কি অপূর্ব কথার উল্লেখ আছে অগ্নিপুরাণে, তার কথা বলছি। তাতে পাই—

নরং তুর্লভং লোকে
বিদ্যা তত্র সুতুর্লভা।
কবিত্বং তুর্লভং তত্র
শক্তি স্তত্র সুতুর্লভা ॥

—জগতে মানুষ হয়ে জন্মানো সহজে হয় না, আবার মানুষ হয়ে জন্মালে বিদ্যালভ করা আরো কঠিন। বিদ্যালভ করলেও কবিত্ব লাভ করা আদৌ সহজ নয়, কারণ সেই শক্তি অতি তুর্লভ।

কাব্যের আবার আরো বিভাগ আছে, কেমন মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য। মহাকাব্য যেমন রামায়ণ ও মহাভারত, তার সঙ্গে অনেকে কালিদাস প্রভৃতির কোন কোন রচনার উল্লেখ করেন। খণ্ডকাব্য যেমন কালিদাসের মেঘদূত প্রভৃতি। আর কোষকাব্য যেমন কালিদাসের ঋতুসংহার প্রভৃতি যাতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কবিতা একত্র পাওয়া যায়।

এবার কবির কথা কিছু বলি। আমাদের দেশে মহামুনি
বাল্মীকিকেই বলা হয়, আদি কবি। তাঁর মুখে জেগেছিল প্রথম
কবিতা, ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে শরবিদ্ধ দেখে। সেটি হচ্ছে,

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং হুমগমঃ শাস্বতীসমাঃ।

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম্ অবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

—রে নিষাদ, জগতে তুই কখনো শাস্বত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে
পারবি না, যেহেতু কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ
করেছিস্।

সেই কবিতা মুখ দিয়ে বের হতে তিনি অবাক হয়ে যান নিজেই,
শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মা ও নারদের উপদেশে রামের চরিত্র বর্ণনা করে
রামায়ণ রচনা করেন।

মুনিরাই কি কবি?

রামায়ণে পাই, বাল্মীকি হচ্ছেন প্রচেতা বরুণের পুত্রস্থানীয়।
প্রচেতা শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যিনি প্রকৃষ্ট চেতনা বা বিদ্যা লাভ
করেছেন। বেদে পাই বরুণ ছিলেন মহাকবি। অতএব পাই,
বরুণের পুত্র ভৃগু, ভৃগুর পুত্র চ্যবন ও শুক্র আর চ্যবনের পুত্র
হচ্ছেন বাল্মীকি। যাই হোক, বাল্মীকি যে বরুণের বংশধর, সে
বিষয়ে ডর্ক নেই। কিন্তু সত্যিই কি তিনি আদি কবি? এ প্রশ্ন
জাগে এই কারণে যে, গীতায় দেখছি বিভূতিযোগে শ্রীভগবান
বলছেন : কবিনামুশনাঃ কবিঃ ॥—আমি কবিদিগের মধ্যে কবি
উশনা।

এই উশনা নাম ছিল দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের। শুধু তাই নয়,
ঐ শুক্রের অপর নাম ছিল কাব্য। কে জানে, প্রথম কাব্যের
ধারা ঐ শুক্র থেকেই প্রবাহিত হয়েছিল বলেই, শেষ পর্যন্ত তাঁর
নাম “কাব্য” হয়ে গিয়েছিল কিনা। তবে আগে আমরা বাল্মীকির

যে বংগপরিচয় পেলাম, তাতে দেখছি গুরু হচ্ছেন বান্মীকির পিতৃস্থানীয় বা পূর্বপুরুষ।

উশনা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে, ইচ্ছার্থক 'বশ্' ধাতু থেকে। বাস্তবিক, প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী না হলে কেউ কবি হতে পারেন না। উশনার কোন কাব্য কিন্তু আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছায় নি। অবশ্য বেদের কিছু মন্ত্রে ঐ কাব্য নামধারী কবির উল্লেখ আছে, আর উশনা নামধারী ঋষির এক-আধটি মন্ত্রও চোখে পড়ে; একটি যেমন—শ্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তবে মিত্রমিব প্রিয়ং অগ্নে রথং ন বেতুম্॥ —তোমাদের অতি প্রিয় অতিথি অগ্নিকে প্রিয়বন্ধুর মতই বা প্রিয় সূর্যের মতই স্তব করি। হে অগ্নি, তুমি যখন আসো, তখন রথের মতই তোমায় জানা যায়।

কিন্তু শেষপর্যন্ত গুরুাচার্য হয়ে উঠলেন দৈত্যদের কুলগুরু। তিনিই জানতেন সঞ্জীবনীমন্ত্র। এই মন্ত্র পাবার জন্তে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ তাঁর শিষ্য হন। তিনি আবার সুরা তৈরি করতেও জানতেন। অনেকে মনে করেন, তিনি ছিলেন রসায়ন-শাস্ত্রে পারদর্শী। তবে কি এইটিই সত্য যে, ষাঁরা বেদচর্চা করতে চাইতেন না, তাঁরা কেবল সুরা ও কাব্যচর্চাই করতেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

তবে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করবার যে, মুনিগোষ্ঠীর লোকেরাই কাব্যরচনায় পারদর্শী ছিলেন। রামায়ণের রচয়িতা মুনি বান্মীকি, আবার মহাভারতেরও রচয়িতা মুনি ব্যাস। আমরা দেখেছি, আদিকালে মুনিরা ছিলেন অ-বৈদিক।

ঋষি ও মুনি উপাধির সমন্বয়

কিন্তু একটা সমস্যা থেকে যায় তবু। সে হচ্ছে গীতার বিভূতিযোগে আবার দেখা যাচ্ছে—মহর্ষিগাং ভৃগুরহং॥ —মহর্ষিদের

মধ্যে আমি ভৃগু। একটি কথা এখানে বলে রাখি যে, গীতার ঐ বিভূতিযোগ অর্থাৎ দশম অধ্যায়টি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই জানতে পারা যায়, আমাদের দেশে পুরাকালে কোন ব্যক্তি বা বস্তু রূসব থেকে প্রথম ছিল।

এখন মহর্ষি বলা হলো কেন ভৃগুকে তার কথা বলার চেষ্টা করি। ভৃগু যে মুনিবংশের লোক, তার প্রমাণ তিনি বরুণের পুত্র। আমরা জেনেছি, সেই আদি যুগে বরুণ ছিলেন অশুর বা দৈত্য বা কর্মী মুনি আর মিত্র ছিলেন সুর বা দেব বা জ্ঞানী ঋষি। তাঁদের মধ্যে আদিযুগে যুদ্ধও হয়েছিল চাষের জমি নিয়ে। চাষের জমি তো ছিল সেকালে সমুদ্রের তীরে, তাই বরুণ ছিলেন সমুদ্রের রাজা। পরবর্তী যুগে অবশ্য তাঁদের সন্ধি হয়, তখন উভয়ের নামও সংযুক্ত ভাবে হয়ে ওঠে মিত্রাবরুণ। সে কথা আমরা আগেই জেনেছি। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই নামের মধ্যে মিত্র আদিত্যে, বরুণ অন্তে। পরের যুগের কথাতেও আমরা জেনেছি, বরুণপুত্র বা বরুণগোত্রের বশিষ্ঠের সঙ্গে মিত্রগোত্রের বিশ্বামিত্রের বিষম বিরোধ ও শেষে সন্ধির কথা। মনে হয় সেই সময় থেকেই মুনিদের দেওয়া হলো বৈদিক উপাধি মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি, আর ঋষিরাও গ্রহণ করলেন অবৈদিক মুনি উপাধি। তাই গীতায় যেমন দেখি, ভৃগুকে বলা হয়েছে মহর্ষি, রামায়ণে তেমনি দেখি, বিশ্বামিত্রকে বলা হয়েছে মহামুনি। ভুললে চলবে না যে, রামায়ণের যুগ বা রামরাজত্বের কালই ছিল মুনি ও ঋষির সমন্বয়ের যুগ। মহাভারত ও তার অন্তর্গত গীতা তো পরবর্তী যুগে রচিত।

ভৃগুবংশের বৈশিষ্ট্য

আবার একটি মজা যে, ভৃগুর অগ্র পুত্র জমদগ্নিও মুনি নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁর পুত্র পরশুরাম মুনিধর্ম ছেড়ে ঋষিধর্ম গ্রহণ করেন। পুরাণে তাই পাই পরশুরামের জন্ম হয়েছিল ক্ষাত্রতেজে।

বেদের মন্ত্রগুলির মধ্যে বেশ প্রমাণ আছে যে, অথর্বার সঙ্গে ভৃগুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল অগ্নিমন্ত্রন বিচার দিক থেকে। অথর্বার সঙ্গে তাই ভৃগুকে পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণে পাই, ভৃগু ছিলেন দক্ষের যজ্ঞে প্রধান ঋষিক বা ব্রহ্মা। অথর্ববেদে অধিকার না থাকলে কেউ ঐ কাজ করতে পেতেন না।

এই ভৃগুদের সম্বন্ধে আরো একটি কথা বলে নিই। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন যে, ভৃগুবংশের দেশ ছিল ভারতবর্ষের অন্তরীপ অংশের দক্ষিণ পশ্চিমে, বর্তমানে যে ভাগের নাম কেরল। সেই কেরল অংশেই বাস করতেন পরশুরাম। শেষ পর্যন্ত তপস্যা করবার জন্য ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে লৌহিত্য নদের, যার বর্তমান নাম ব্রহ্মপুত্র, তীরে এসে উপস্থিতি হয়েছিলেন। এর থেকে বেশ বোঝা যে, সেই যুগেও সুদূর দক্ষিণ প্রান্তের সঙ্গে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তের যোগাযোগের কেমন ব্যবস্থা ছিল।

মুনি ও ঋষির জীবনযাত্রা

যাই হোক, ভৃগুর কথা বলতে গিয়ে একটি বড় বিচিত্র তথ্য পেয়ে যাচ্ছি আমরা যে, ভৃগুর থেকেই দুটি গোষ্ঠীর পত্তন হয়েছে। একটি গোষ্ঠী রইলেন কৃষি ও গোপালন নিয়ে, তাঁরা হলেন মুনি-পন্থী, আর একটি গোষ্ঠী আগুন ও অস্ত্রের প্রয়োগ শিখে শিকারে মন দিলেন, তাঁরা হলেন ঋষিপন্থী। মুনিরা লিখতে শিখে কাব্য রচনায় পারদর্শী হলেন, কিন্তু ঋষিরা মুখে মুখে মন্ত্র তৈরির করার চেয়ে বেশী কিছু করতে পারলেন না। ঐ মুনিদেরই ছিল শস্ত্র বা গোধন রাখার দৃঢ় গৃহ, তাঁরা ছিলেন স্থাবর। ঋষিদের ওসব বালাই ছিল না, তাঁরা ছিলেন যাঁযাবর, তাঁদের বড় জোর থাকতো শিবির নয় পর্ণকুটীর, যা তাঁরা কাঁধে নিয়েই বেড়াতেন বা ফেলেই চলে যেতেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রজাপতি কণ্ঠ্যপের কথা। তিনি

তো তাবৎ প্রাণীমাত্রেয়ই পিতা। তাঁরো বড় ছেলেরা হচ্ছে দৈত্য, আর তার পরের ছেলেরা আদিত্য। দৈত্যরা সব সময়ে পাতালে বা সমুদ্রে বাস করতেন আর দেবতা বা আদিত্যরা বাস করতেন উচ্চভূমিতে বা স্বর্গে।

পাতাল কি আর স্বর্গই বা কি?

জলাভূমি বা সমুদ্রের দিকই হচ্ছে পাতাল, যেখানে চাষবাস হয়, আর উচ্চভূমি বা পর্বতের দিকই হচ্ছে স্বর্গ। এই কথা আজও সত্য। বাদা বা নাব্য অঞ্চলে যাঁরাই চাষবাস নিয়ে থাকেন, তাঁদের হীন মনে করেন শহর অঞ্চলের মানুষরা। আবার রেলপথে যে ট্রেনগুলি সমুদ্রের দিকে যায় তাদের নাম, ডাউন অর্থাৎ নিম্নমুখী, আর যেগুলি পর্বতের দিকে যায় তাদের নাম, আপ অর্থাৎ উর্ধ্বমুখী। এটি মনে রাখার।

কিন্তু যা বলছিলাম, মুনিপন্থীদের সর্ব সৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও, ঋষিপন্থীরা আগুন ও অস্ত্রের বলেই তাঁদের কোণঠাসা করেছিলেন সেই যুগে। অনেকে মনে করেন, সিন্ধু সভ্যতার যে সমস্ত নিদর্শন হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো থেকে খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, কত সুন্দর নগরের ধ্বংসাবশেষ সেগুলি। অনেকেরই ধারণা যে, সেইসব পুরাকালের পুর বা নগর ধ্বংস করেই ইন্দ্র লাভ করেছিলেন পুরন্দর উপাধি। দাক্ষিণাত্যে যাঁরা দ্রাবিড়-মুন্নেত্র-কাজ্জাবাম নাম নিয়ে আন্দোলন করছেন তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতাকে নষ্ট করেছে আর্যসভ্যতা। সেই দ্রাবিড় সভ্যতাই এক কালে নগর নির্মাণ করছিল সিন্ধু উপত্যকায়, একথা ঐতিহাসিকদের কাছে শোনা যায়।

তামিল বা দ্রাবিড় সভ্যতা

এখানে তামিল সম্বন্ধে কিছু বলি। দ্রাবিড় শব্দ থেকেই তামিল শব্দটি উৎপন্ন, এই মত অনেক পণ্ডিত পোষণ করেন। তবে

তামিল ভাষা যে অতি প্রাচীন তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ তামিল ভাষায় হাতে-লেখা পুঁথি যত প্রাচীনকালের পাওয়া যায়, সংস্কৃত ভাষায় তা পাওয়া যায় না। আবার একটি কথা ভারি বিচিত্র যে, তামিল ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন অগস্ত্য, কলহস্তীতে আজো তাঁর মন্দির আছে ঐ তামিলনাড়ে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এই অগস্ত্য পরবর্তী যুগের মানুষ, বশিষ্ঠের সমসাময়িক অগস্ত্যের থেকে ভিন্ন।

কিন্তু ঐ তামিল ভাষার বর্ণমালার মধ্যে একটি অপরূপ বিশেষ লক্ষ্য করবার। এই ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণের প্রত্যেকটি বর্ণে আছে শুধু প্রথম ও পঞ্চম বর্ণ। যেমন ক বর্ণে আছে কেবল ক আর ঙ। এমনি প্রত্যেক বর্ণে। ফলে সংস্কৃতের পঁচিশটি বর্ণীয় বর্ণের মধ্যে মাত্র দশটি আছে ঐ তামিল ভাষায়। কে জানে উচ্চারণের সুবিধার জন্তে ঐ তামিল বর্ণমালাকে সংস্কার করে প্রত্যেক বর্ণে আরো তিনটি করে বর্ণযোজনা করা হয়েছে কিনা পরবর্তীকালে। তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে তো মানতেই হয়, তামিল অতি প্রাচীন ভাষা। এসব প্রশ্ন মনে জাগে এই দেখে যে, বেদের মধ্যেও “দ” আর “থ” এই দুটি অক্ষরের বদলে বহুস্থানে ‘ধ’ ব্যবহার করা হয়েছে, আর “হ” অক্ষরের বদলে ‘ভ’ ব্যবহার করা হয়েছে। আর একটি কথা প্রসংগত মনে পড়লো যে, ঐ ডাবিড় বা তামিল সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কৃতির যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তার বেশ কিছু বিবরণ দিয়েছেন প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বহু গবেষণালব্ধ গ্রন্থ “বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে”। এখানে উল্লেখ্য যে, ঐ ‘মঙ্গল’ শব্দটিও এসেছে তামিল ভাষা থেকেই।

রাক্ষস কবি—রাবণ

দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষকে তো রামায়ণে বানর, হনুমান, ঝাফ ও পক্ষী বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সবাই কত বিদ্বান ও

বুদ্ধিমান ছিলেন তার কথা রামায়ণেই আছে। আবার রাক্ষসদের প্রধান যে রাবণ, তিনিও ছিলেন কবি। আজো পর্যন্ত তাঁর রচিত পঞ্চচামর ছন্দে শিবতাণ্ডবস্তোত্র সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেন। তার একটি শ্লোক এখানে উদ্ধার করবার লোভ সামলাতে পারছি না :

জটাটবীগলজ্জলপ্রবাহ প্লাবিতস্থলে
গলেহবলস্থলস্থিতাং ভুজংগতুংগমালিকাম্।
ডমড্ ডমড্ ডমড্ ডমগ্নিনাদ-বড্ডমব্যয়ং
চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্।

—জটার অটবী বা অরণ্য থেকে গলে পড়ছে জলের ধারা, সেই জলে প্লাবিত স্থানে গলায় লব্ধিত প্রকাণ্ড সাপের মালা বুলিয়ে, ডম ডম শব্দে অব্যয় ডমরু বাজিয়ে, যে শিব চণ্ডতাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন, তিনি আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, আমাদের কালেও স্বনামধন্য ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ পঞ্চচামর ছন্দে লিখেছিলেন “সিন্ধুতাণ্ডব” কবিতা, তার শুরু করেছিলেন :

মহৎ ভয়ের মূৰ্ৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃ শ্রামল।
মহেশ্বরের প্রলয় পিনাক
বাজাও আবার বাজাও কেবল ॥

কবি শুক্ৰাচার্যের কাব্যধারার লোপ হলো কেন

কিন্তু শুক্ৰাচার্যের সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন মনে জাগে যে, তাঁর কোন বৃহৎ কাব্য কেন আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছল না, যদিও তাঁরই গোষ্ঠীর বাম্বীকির রামায়ণ আজো সুপ্রচলিত? এই কি তবে সত্য যে, যেহেতু বাম্বীকি ঋষিতান্ত্রিকদের প্রতিষ্ঠিত সূর্যবংশের কাহিনী

নিয়েই রামায়ণ লিখেছিলেন, তাই তা বেঁচে রইলো মুনি ও ঋষিদের সমন্বয় ঘটান ফলে, কিন্তু তাঁর পূর্বসূরী শুক্রাচার্য কটুর মুনিতান্ত্রিক ছিলেন বলেই তা রক্ষা করবার দায়িত্ব কেউ নেন নি ? শুক্রাচার্য তো দৈত্য ও দেবতাদের বিষম যুদ্ধের সময়ে দৈত্যদের গুরু হয়েছিলেন। আমরা জেনেছি, দৈত্যরাই মুনি বা কর্মী আর দেবতারাি ঋষি বা জ্ঞানী।

কাব্যের প্রসার ও বৈচিত্র্য

কলিযুগে কাব্য কি প্রসার লাভ করলো এখন তারই কথা বলি। ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রই মনে হয়, সবচেয়ে প্রাচীন অলংকার শাস্ত্র। তাতেই পাই নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য সম্বন্ধে সবকিছু নির্দেশ, কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধেও বহু কথাই তাতে আছে।

পণ্ডিতজনেরা মনে করেন যে, ভরত মুনির “নাট্যশাস্ত্র” ও নন্দিকেশ্বরের “অভিনয় দর্পণ” বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের আগেকার রচনা। কারণ ঐ দুই গ্রন্থে অবতারের সম্বন্ধে যে মুদ্রা অর্থাৎ হস্তপদাদির ভংগীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে বুদ্ধদেবের কোন মুদ্রা দেওয়া নেই। তবে লোকখ্যাত পণ্ডিত মনোমোহন ঘোষ তাঁর তৈরি নাট্যশাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদের টিপ্সনীতে জানিয়েছেন যে, বৌদ্ধরা যে কোষে বাস ব্যবহার করতেন, সেই যুগে সেই বাসকে অনুর্বরতা ও অসাকল্যের প্রতীক বলে লোকে ঘৃণা করতো। এর থেকেই মনে হয় যে, তখনো সবাই বুদ্ধদেবকে অবতার বলে স্বীকার করেন নি। পরবর্তী যুগে কিন্তু বুদ্ধদেবকে দশ অবতারের নবম বলে মেনে নেয়া হয়েছে। হয়তো আচার্য শংকরই প্রথম বুদ্ধদেবকে অবতার বলে গণ্য করেন তাঁর রচিত দশাবতার স্তোত্রে; যদিও বৌদ্ধ কাপালিকদের তিনিই উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর অদ্বৈতবাদ।

কাব্য কিন্তু মানুষের সামনে এক অপূর্ব আদর্শ তুলে ধরলো।

কাব্যের প্রথম যুগে অবশ্য নানা দেবতার বা পৌরাণিক চরিত্র নিয়েই কবিরা লিখতেন, যেমন দেখা যায়, কালিদাসের কুমারসম্ভবে বা রঘুবংশে। ক্রমশ কিন্তু দেবতাদের চরিত্রে দেবত্ব না দেখিয়ে মনুষ্যত্ব কতখানি আছে তারই বর্ণনা করতে লাগলেন কবিরা। যেমন দেখি, ভবভূতির উত্তররামচরিতে। আরো পরে দেখা যায় পুরাণ ও ইতিহাসের চরিত্রকে ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়ের মানুষদের নিয়ে কাব্য লেখা হয়েছে। তার প্রমাণ মেলে ভাস রচিত স্বপ্নবাসবদত্তা বা শূদ্রক রচিত মুচ্ছকটিকে। মুচ্ছকটিক নামটিও মজার, মৃৎ + শকটিক অর্থাৎ মাটির তৈরি ছোট্ট গাড়ি।

নাট্যাভিনয় কাদের দান

ক্রমে শুরু হলো কাব্য পাঠ ও নাটকাদি অভিনয়ের ব্যাপার। এই নাটক অভিনয়ের সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, এটি দ্রাবিড় দেশের অবদান। এই আধুনিক কালেও সেই দেশে প্রাচীন কথাকলি নৃত্য ও ভরতনাট্যম্ নৃত্যের সমধিক চর্চা আছে। নৃত্যের সঙ্গে নাটকের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ তা ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র থেকেও যেমন জানা যায়, তেমনি জানা যায় তামিল ভাষার প্রাচীন পুঁথি, ‘শিল্পাদিকারম্’ থেকেও। ভরত মুনি তো নট বা অভিনেতার আর এক নাম বলেছেন নর্তক।

অনেকে অবশ্য বলেন যে, উত্তর অঞ্চলেও নৃত্যের প্রাচীন ধারা বহন করেছে, কথক নৃত্য। কিন্তু সেই নৃত্য যে দক্ষিণ অঞ্চলের নৃত্যরীতির চেয়ে প্রাচীন নয়, তাও নৃত্যবিদরা জানেন।

এতক্ষণে আমরা বেশ বুঝতে পাচ্ছি, বিদ্যা বা বেদের শাখা কতদিকে কতভাবে প্রসারিত হয়ে গেল। মনে পড়ে সপ্তশতী চণ্ডীতে দেবতার দেবীকে স্তব করতে গিয়ে বলছেন—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ॥—হে দেবি! জগতে যত যত বিদ্যা আছে সবই তোমারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ।

চণ্ডীর সঙ্গে বিচার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ বলেই ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত, যার অপর নাম বাক্‌সূক্ত পড়ার নির্দেশ আছে। সেই বাক্‌সূক্ত সম্বন্ধে আমরা আগেই জেনেছি ত্রেতাযুগের কাহিনীতে।

এ সপ্তশতীর মন্ত্যংশটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, বিদ্যা হচ্ছে আঠারোটি, যথা চারটি বেদ, তার ছ'টি অংশ—মীমাংসা, শ্রায়, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ—এই হলো চৌদ্দ, আর চারটি হচ্ছে আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র।

আবার তার সঙ্গে যোগ করতে হবে চৌষট্টি কলা বিদ্যা। অর্থাৎ সর্বসমেত বিচার আছে বিরাশিটি বিভাগ। তবু তো এর মধ্যে ধরা হয় নি স্থাপত্যবেদ, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র, আর ধরা হয়নি ধর্মশাস্ত্রের বিংশতি শাখা, পুরাণের আঠারোটি শাখা ও মহাকাব্য ছ'টি। অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক বিদ্যা অবশ্য চৌষট্টি কলাবিচার মধ্যে ধরা হয়েছে, নাট্যবেদ এমন কি ইন্দ্রজালও।

এতো বিভাগের ফল হলো এই যে, কেবল বেদ নিয়ে চর্চা করতেন অতি অল্প কয়েকজন। তাঁরা অতি কষ্টেই প্রতিপালন করতে পারতেন তাঁদের ছাত্রদের। তখন তো ছাত্ররা গুরুর গৃহেই বাস করতেন পাঠকালে। সৌভাগ্যবশতঃ কোনও বেদজ্ঞ যদি কোন রাজার পুরোহিত হবার সুযোগ পেতেন, তাঁরই পক্ষে সম্ভব হতো পাঠশালা ভাল করে চালানো। ব্রাহ্মণরা সবাই মন্ত্রিত্বলাভের চেষ্টাই করতেন তখন, কারণ সেই পথেই জীবনধারণের উত্তম অবকাশ ঘটতো। রাজারা প্রায়শই মন্ত্রী ও সেনাপতিদের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে, কাব্যচর্চা না হয় নৃত্যনাট্যাদি নিয়েই মেতে থাকতেন।

ওদিকে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম তো প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে প্রচার শুরু করে সাধারণ সমস্ত মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করছিল। বেদের চর্চা করবে কে? যেভাবে বেদকে নিয়ে নানা সূত্রের ব্যুৎপত্তি তৈরি করেছিলেন বেদজ্ঞজন, তা ভেদ করে বেদমন্ত্রের রস গ্রহণ করা সবার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। আরো এক বিপদ দেখা দিল,

সম্প্রদায়ভেদ ও মতভেদ

আচার্য শংকর, আচার্য রামানুজ, আচার্য মধু ও আচার্য বল্লভ ক্রমাগত উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করে পরস্পর ব্যস্ত হলেন নিজের নিজের মত প্রতিষ্ঠায়, দেখালেন তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের বিচার দৌড়, তৈরি করে গেলেন তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়। যদিও সবাই বললেন তাঁরা, বেদই হচ্ছে তাঁদের প্রত্যেকের মতের মূল, কিন্তু কর্ম সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই উদাসীন ভাব প্রকাশ করলেন, বিরাট জ্ঞান ও ভাবের প্রাসাদ রচনা করে গেলেন।

বেদের মধ্যে কি আছে তা আর খুঁজে দেখার কষ্ট কে করবে কেনই বা করবে? যিনি যতটুকু মুখস্থ করে রেখেছিলেন পূর্বাচার্যদের মুখে শুনে সেইটুকুই ধরে বসে রইলেন। বেদের পুঁথিগুলি যে কোথায় রইল, তা জানবারও বোধহয় কেউ চেষ্টা করলেন না। যিনি বা পেলেন বেদের পুঁথি, তিনি সে পুঁথিকে পরম ভক্তিতে ফুল পাতা দিয়ে পূজো করে ধাতু হতে লাগলেন। যার পূজো করছি সে কি ও কেমন তার কোনই খোঁজ করা হলো না!

যাঁরা যোগচর্চার পথে গেলেন, তাঁরা আবার আরো ভয়ানক কথা শোনালেন, বললেন—“বেদ পড়ে কিছু হয় না, তারো বেশী জ্ঞানার আছে, প্রত্যেকের আপন অন্তরের মধ্যে।”

তাঁদের কথার প্রতিধ্বনি জাগলো তত্ত্বশাস্ত্রে। সবাই তখন এক-যোগে বেদ ছেড়ে অথবা কর্ম ছেড়ে ভাবের পথে ছুটলেন।

আরো একদল জেগে উঠলেন, যাঁরা পুঁথির বাইরে আর কোন কথাকেই বিশ্বাস করতেন না। ভুলেই গেলেন তাঁরা যে এ জগতের সংগে যদি পুঁথির কথাকে মিলিয়ে নিতে না পারি, তবে কোনই সার্থকতা নেই মুখস্থ বিচার। শেষ পর্যন্ত তাই বিধিনিষেধের বাঁধনে এমনি আবদ্ধ হয়ে গেল সমাজ যে, তার আর প্রসারের পথ রইল না কোন দিকে। চতুর্দিকেই রব উঠলো—“ধর্ম যায়, ধর্ম যায়!”

সামান্য ক্রটি-বিচ্যুতিতেই লোককে একেবারে বিজাতীয় মনে করা হতে লাগল। কালাপানি অর্থাৎ সমুদ্র পার হলে জাত যাবে, অশ্ব বর্ষের সংগে ওঠা বসা করলে জাত যাবে। সে যে কি গণ্ডিবাঁধা অবস্থার সৃষ্টি হলো বলার নয়, কোন মানুষের যেন নড়েচড়ে বসার উপায় রইল না। উত্তম হয়ে রইল স্মৃতিশাস্ত্রের তর্জনী সবাইকে শাসন করতে। তার সংগে ঘোগ দিল তন্ত্রের নানা আচার অনুষ্ঠান। কি ভাবে তন্ত্র হিন্দুর ধর্মে জিনে বসেছিল, তার প্রমাণ পাই আফিকের মস্ত্রই।

আফিককৃত্য তো বৈদিক আচার, বেদের মস্ত্রই আবৃত্তি করতে হয় সেই ক্রিয়ায়। কিন্তু তন্ত্রের প্রভাবে হলো এই যে, বৈদিক পুরুষ দেবতা সবিতার উদ্দেশে যে গায়ত্রীচ্ছন্দের মস্ত্র ঐ আফিকের বিশেষ অংগ, সেই গায়ত্রীকে কুমারী, যুবতী ও বৃদ্ধারূপে ধ্যান করার বিধান জাগলো, সেই সংগে শাপোদ্ধার, কবচ প্রভৃতি আরো আনুষংগিক— যা একেবারে তন্ত্রের নিয়মিত আচার অনুষ্ঠান।

বেদচর্চার অভিনব প্রয়াস—আচার্য সায়ণের কীর্তি

এতক্ষণে আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি, কি ভাবে বেদের চর্চা নানাদিক থেকে ব্যাহত হয়েছিল। এবার বলি আবার কি ভাবে বেদের চর্চা নতুন করে শুরু হলো।

হিন্দু রাজত্বের একেবারে শেষের দিকে রাজা হরিহর ও তাঁর ভাই বৃদ্ধ স্থাপন করলেন বিজয়নগরে রাজধানী। সেই পুরাতন বিজয়নগর বর্তমানে ভিজিয়ানা গ্রাম নামে খ্যাত। তাঁরই মন্ত্রী ছিলেন মহাপণ্ডিত আচার্য মাধব। অনেকে বলেন তিনিই আচার্য সায়ণ নাম নিয়ে বেদের ব্যাখ্যার সূত্রপাত করেন। আবার কেউবা বলেন, আচার্য সায়ণ ছিলেন আচার্য মাধবেরই ভাই। মোট কথা, আচার্য সায়ণের ব্যক্তিগত পরিচয় খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু তাঁর কীর্তি, বেদের

ভাষ্য এখনো ভাস্বর হয়ে আছে। আচার্য সায়ণের সহস্রকে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত “সায়ণের বেদভাষ্য ভূমিকার” গোড়ায়, তাতে সায়ণের পরিচয় আরো একটু বেশী পাওয়া যায়।

আচার্য সায়ণ অবশ্য চতুর্বেদের সমস্ত শাখার ভাষ্য করেন নি। তিনি ভাষ্য করেছেন—

শাকল শাখার ঋগ্বেদ, কোথুম শাখার সামবেদ, তৈত্তিরীয় শাখার কৃষ্ণজুর্বেদ, কাষশাখার গুরুজুর্বেদ ও গৌনক শাখার অথর্ববেদ।

বেদমন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করবার একমাত্র উপায় আচার্য সায়ণের ভাষ্য।

আমরা আগেই জেনেছি চারিবেদ কতগুলি শাখায় বিভক্ত ছিল। অনেক পণ্ডিত তাই মনে করেন যে, আচার্য সায়ণের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ অশ্রাশ্র শাখার মতামত সায়ণের ভাষ্য থেকে জানার উপায় নেই। কিন্তু আচার্য সায়ণ যেগুলির ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন, সেইগুলি ছাড়া অশ্রাশ্র শাখার সব বেদ তো খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং সে কথা তুলেই বা লাভ কি?

আচার্য শাকল্যের পদপাঠ

এখানে বলে রাখা দরকার যে, বেদকে বুঝে নেবার প্রথম পথ দেখান আচার্য শাকল্য পদপাঠ রচনা করে। তাতে তিনি বেদমন্ত্রের সংহিতাপাঠ অর্থাৎ সন্ধিযুক্ত পাঠকে বিভাগ করে প্রত্যেকটি পদকে আলাদা করে দেখিয়েছেন। যেমন বেদমন্ত্রে যেখানে ছিল—

অগ্নিমীলে, কিংবা দেবমৃষিজং

আচার্য শাকল্য তাকে ভেঙে করে দিলেন—

অগ্নিম্ + ঈলে, কিংবা দেবম্ + ঋষিজং ইত্যাদি।

এইভাবে পদপাঠ রচনা করে আচার্য শাকল্য যে বেদকে আরো বোধগম্য করে দিলেন, এ কথা বেদজ্ঞ মাত্রেই জানেন।

আচার্য সায়ণের ভাষ্য রচনার বৈশিষ্ট্য

সায়ণ কিন্তু ভাষ্য করতে গিয়ে কেবলই যে যাস্কের নিরুক্ত ও পাণিনির ব্যাকরণের ওপর নির্ভর করেছেন তাই নয়—তিনি নিজেও বহু স্থানে বহু অর্থের প্রস্তাব করেছেন, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, কল্পসূত্র, পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের সংগে সামঞ্জস্য করে। মোট কথা, বেদের গভীরে যেতে হলে তাঁর ভাষ্য মেনে নেওয়া ছাড়া কোন পথ নেই। ক্রমে অবশ্য বহু পণ্ডিত আচার্য সায়ণের নির্দেশিত পথে এগোতে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত আচার্যকেই নস্যাৎ বার বার চেষ্টা করেছেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আচার্য দ্রোণ শিষ্য অর্জুনের কাছেই পরাস্ত হন। এ সম্বন্ধে চমৎকার একটি প্রবাদ আছে সংস্কৃত ভাষায়—

সর্বত্র জয়মদ্বিগোং পুত্রাচ্ছিত্যাং পরাজয়ম্ ॥

—লোকে সবায়ের কাছেই জয় লাভ করতে চায়, কেবল পুত্র ও শিষ্যের কাছেই চায় পরাজয় লাভ করতে।

সত্যিই তো পিতা চান পুত্র যেন তাঁর থেকেও বড় হয়, আর গুরুও চান শিষ্য যেন তাঁর থেকেও পণ্ডিত হয়।

মুসলমানদের শাসনকালে বেদচর্চার বিপত্তি

যাই হোক, আচার্য সায়ণ বেদের ভাষ্য প্রকাশ করে, বেদকে সবার বোধগম্য করে দিলেন বটে, কিন্তু হায়! বেদচর্চার প্রসার তেমন হলো না। তার কারণ ঐ সময় থেকেই ভারতে মুসলমান-আগমন শুরু হয়েছিল। হিন্দু রাজারা উৎসর্গে যেতে বসলেন। দেশে একদিকে যেমন দেখা দিল অরাজকতা, তেমনি আর একদিকে

ধর্মকে বাঁচাবার জন্তে হিন্দুরা হয়ে উঠলেন আরো গোঁড়া। কে আর তখন নিবিষ্টমনে বেদচর্চা করবে ?

বেদ তো সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি, সেকথা আমরা আগেই জেনেছি, ছিল মুষ্টিমেয় বিদ্বানের মধ্যেই অবরুদ্ধ। সেই বিদ্বানরাও অস্থির হয়ে উঠলেন মুসলমানদের ভয়ে। ঐতিহাসিকরা বলেন, সেই সময়ে বিজাতি বিজেতারা বহু পুঁথিশালাই পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। সব থেকে বিপত্তি দেখা দিল, যখন হিন্দুদের ধরে ধরে বিজেতারা ধর্মাস্তুরিত করে নিলেন।

হিন্দুধর্মের মধ্যে তো বেশ জেঁকে উঠেছিল শ্রেণীগত বৈষম্য। তাই যাঁরা অনুরত শ্রেণীর মানুষ তাঁদের যথেষ্ট মনোন্ধোভই ছিল। মুসলমানরা যখন দেখালেন যে, তাঁদের ধর্মে শ্রেণীগত বৈষম্য নেই, সুলতান, বাদশা থেকে ফকির, দরবেশ, ভিক্ষুক পর্বন্ত সবাই এক; তখন স্বভাবতই ভাঙন ধরলো হিন্দু সমাজে, বিশেষ করে অনুরত শ্রেণীর হিন্দুরা প্রায় দলে দলেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলেন।

শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের পুনরভ্যুদয়

মুসলমানদের শক্তি ও সৃষ্টি দেখে সেই যুগে গোপনে শক্তি উপাসনার একটি চেষ্টা দেখা দিল, কিন্তু তার তেমন ফল হলো না। ভাগ্যে চৈতন্যদেব দেখা দিলেন ভাগবতের ধর্মকে নতুন করে প্রচার করতে তাই রক্ষা। ঐতিহাসিকরা মনে করেন সেদিন চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয় না হলে, আরো বহু হিন্দু ধর্মত্যাগ করতেন। চৈতন্য-ভাগবত, যা হচ্ছে চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী-কাব্য, তাতে কবি বৃন্দাবন দাস দেখিয়েছেন, কিভাবে শক্তিপূজার নামে নানা অনাচার ও ব্যাভিচার দেখা দিয়েছিল হিন্দু সমাজে।

মরমিয়া সাধকদের চেষ্টা

সেই অবস্থা যে কেবল বাংলাদেশেই হয়েছিল তা নয়, তুলসীদাসের “রামচরিতমানস” থেকে বা সে যুগের মরমিয়া সাধক

কবীর, দাছ, নানক প্রভৃতির দৌহা থেকে কিংবা দক্ষিণ ভারতের সাধক আলোয়ারদের কাছ থেকেও জানতে পাওয়া যায়, তখনকার ভারতের ধর্মের দিককার টেলোমলো অবস্থার কথা। ঐ মরমিয়া সাধক ও আলোয়াররা ছিলেন সবাই সাধারণ হিন্দু কিন্তু উন্নত হিন্দুদের অবস্থা দেখে তাঁরা সবাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মরমিয়াদের একটি দৌহা আছে—বাহমন টাহমন মূরখ ভয়ে শূদ্র পড়ে গীতা—বামুন টামুনরা সবাই হয়ে গিয়েছে মূর্থ। শূদ্ররাই এখন গীতা পাঠ করছে।

বেশ বোঝা যায় ঐ দৌহাটি থেকে সেদিন কি অবস্থা হয়ে উঠেছিল, সারা ভারতের হিন্দু সমাজের। তাই তাঁরাও চেষ্টা করলেন সর্বসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগিয়ে তুলতে।

এখানে বলে রাখি, মরমিয়া সাধকরা ছিলেন যোগপন্থী আর আলোয়াররা ছিলেন ভক্তিপন্থী। তবে যাঁরা গীতার গভীরে প্রবেশ করেছেন, তাঁরা জানেন যোগ হচ্ছে ভক্তির আর এক নাম, যা কর্ম ও জ্ঞানকে সংযুক্ত করে।

মোট কথা সেই যুগে সারা ভারতব্যাপী ভক্তির প্রবাহ জেগে উঠলো, যার ফলে সব দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা দিল এক অভূতপূর্ব ভাবসমন্বয়। সে আবার অন্য কথা।

বেদচর্চার ক্রমবিলুপ্তি

বেদের অবস্থা কি হলো সেই যুগে? যত দূর জানা যায়, বেদমন্ত্র মাত্র কয়েকটিই ব্যবহার করতে লাগলেন ব্রাহ্মণরা ঐ আহিকের কিছু মন্ত্র হিসাবে, অথবা পূজা ও দশকর্মের মন্ত্র হিসাবে। কিন্তু সে মন্ত্র ক্রমে উচ্চারণহ্রষ্ট হয়ে প্রায় অবোধ্য হয়ে উঠলো।

সেইভাবেই কেটে গেল পাঠানদের ও মোগলদের প্রায় ছশো বছর ব্যাপী রাজত্বকাল। সেইকালে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের প্রায় সবাই

ফারসী ও আরবী শিখতে লাগলেন হুলতান ও বাদশাদের দরবারে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্তে। বেদচর্চা ও সংস্কৃতচর্চার দিন অন্ধকার হয়ে গেল। বিছা তখন থেকেই পুরোপুরি অর্থকরী হয়ে উঠলো। বেদ বা সংস্কৃতের চর্চা নিয়ে যাঁরা রইলেন তাঁদের তেঁতুলপাতার বোল ও মোটা চালের ভাত ছাড়া কিছু জুটতো না বলেই মনে হয়। অন্ততঃ নবাবী আমলের শেষ যুগে পরম পণ্ডিত বুনো রামনাথের জীবন সেই ভাবেই কেটেছিল।

জীবিকাকেন্দ্রিক বিছার উপযোগিতা

কিন্তু সবাই কেন রাজী হবেন সেই ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনধারণ করতে। তাই যে বিছা অর্জন করলে আর্থিক লাভ হয় সেই দিকেই বেশীর ভাগ মানুষ ছুটলেন। বাস্তবিক যে বিছা কাউকে সুখে জীবনধারণ করবার পথ দেখায় না, সেই নিষ্ফল বিছার ভার কেই বা চাইবেন বহন করতে? এ কথা সে যুগেও যেমন সত্য ছিল, আজও ঠিক তেমনি সত্য। এখনো তো আমাদের দেশের বিছালয়ে প্রত্যেক ছাত্রকেই নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। অথচ সেই ছাত্রেরা যখন জীবিকার সন্ধান করতে যান, তখন দেখেন কথা বলার ও লেখবার মত ভাষাজ্ঞান আর সামান্য একটু পাটীগণিতের জ্ঞান ছাড়া আর কোন অর্জিত জ্ঞানই তাঁদের কাজে লাগে না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ভুলেই যান, বিছালয়ে কত কষ্ট করে কত বিষয়ের পাঠ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। তাতে অর্থ এবং সময়ও কি তাঁদের কম নষ্ট হয়েছিল? তাইত একান্ত দরকার প্রত্যেক ছাত্রকে যে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে, তা যেন তাঁর জীবিকাকেন্দ্রিক অর্জনের সহায় হয়। যে সব ছাত্র আরো অগ্রসর হতে চান জ্ঞানের পথে, তাঁদের পথ তো খোলাই রইলো। কিন্তু সর্বাগ্রে সবায়ের প্রয়োজন জীবিকাকেন্দ্রিক শিক্ষা। সেই শিক্ষাই তো প্রত্যেক

ছাত্রকে আরো অগ্রসর হবার পথ দেখাবে। এই কথাই ভেবেছিলেন সেই প্রাচীনকালের আচার্যেরা, তাই সর্বদাই তাঁরা শিগ্রকে জীবিকাকেন্দ্রিক শিক্ষা দান করতেন। তার কথা আমরা তো উদ্দালকের ও সত্যকামের শিক্ষা-লাভের উপাখ্যান থেকে জেনেছি। বাক সে কথা!

ইংরেজদের আগমনে দেশের নবজাগরণ

মুসলমান রাজত্বের শেষ হলো ইংরেজদের আগমনে। ভারতের মানুষ আবার পড়লেন মহা সমস্যায়, বাধ্য হলেন তাঁরা নতুন করে ইংরেজী শেখার দিকে ঝুঁকতে, কোথায় রইল বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চা আর কোথায় বা রইল ফারসী আরবী শেখার গৌরব!

সেই যুগসন্ধিক্ষণে দেখা দিলেন রাজা রামমোহন রায়। আর দেখা দিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আজকে ভারতবর্ষের যে রূপ দেখা দিয়েছে তারই স্বপ্ন ছিল তাঁদের চোখে। আর তারই প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হলেন বাংলায় যুগাবতার রামকৃষ্ণদেব আর পাঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ।

আপ্রাণ চেষ্টা করে রাজা রামমোহন ও পণ্ডিত বিদ্যাসাগর দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করলেন। রাজা আরো লক্ষ্য করলেন যে, ইংরেজ চাইছেন এ দেশে তাঁদের বিজাতীয় ধর্মও প্রচার করতে। বহুজনকে জোর করে বা লোভ দেখিয়ে তাঁরা খৃষ্টান করে নিলেন, অনেকে আবার স্বেচ্ছায়ও খৃষ্টান হলেন। হিন্দু সমাজে বেশ আঘাত লাগলো। রাজা তো প্রথম জীবনে ছিলেন ঘোর শাক্ত, কালীর পূজো করতেন, ক্রমে ফারসী ও আরবী শিখে একেশ্বরবাদী হয়ে ওঠেন, অবশেষে নজর দেন উপনিষদের একেশ্বরবাদে। প্রচার করলেন তিনি সংস্কারমুক্ত ব্রাহ্মধর্ম।

ঐতিহাসিকরা জানেন যে, রাজা যদি হিন্দু ধর্মের নানা দিককার গোঁড়ামী ভেঙে দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার না করতেন, তাহলে আরো

বহু গৌড়ানী ভারতীয় খৃষ্টান হয়ে যেতেন। যেমন হয়েছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমাহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে প্রভৃতি।

হিন্দুরা কিন্তু ব্রাহ্মদের সহ করতে পারলেন না, যদিও রাজা মূল উপনিষদের শাণ্ডিল্যবিচার থেকে আহরণ করলেন, ব্রাহ্মধর্মের মর্মবাণী—সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম ॥ অর্থাৎ এই জগতের যা কিছু সবই হচ্ছে ব্রহ্ম। আর ব্রাহ্মধর্ম যারা গ্রহণ করলেন তাঁরাও পরিচয় দিতেন, “এন্লাইটেন্‌ড্‌ হিণ্ডু” বা সংস্কারমুক্ত হিন্দু বলে। গোঁড়ামী দূর করার কাজে বিজ্ঞানাগরও আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

অন্যদিকে যুগাবতার রামকৃষ্ণদেব হিন্দুধর্মের মধ্যে দিয়েই জাগিয়ে তুললেন, মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা ও সর্বধর্মসম্বন্ধ। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তো সারা বিশ্বে আলোড়ন জাগালেন সেই মানুষ ভালবাসার কথা শুনিয়ে। শেষে বেলেুড়ে মঠ তৈরি করে নিরন্ন অশিক্ষিত মানুষের প্রতীক রূপেই তো প্রতিষ্ঠা করলেন রামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি, সর্বধর্মসম্বন্ধের ভিত্তি।

স্বামী দয়ানন্দও সংস্কারমুক্ত আর্বসমাজ স্থাপন করলেন, চতুর্বেদের মূল সত্যের ভিত্তিতে। কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ যে ব্যাখ্যা করলেন বেদের, তা তখনকার হিন্দুরা কেউ মেনে নিলেন না। তাই আর্বসমাজও একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হয়ে উঠলো।

বেদচর্চার দুর্ভিত্তিক্রম্য বাধা

বেদের চর্চা করবার আবার একবার চেষ্টা চললো বটে নানাস্থানে, কিন্তু মুশকিল বাধলো নানা শাখা বিভাগের ফলে। যার বর্ণনা আমরা আগেই জেনেছি। কালে কালে বেদের অঙ্গীভূত বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রত্যেকটিই হয়ে উঠেছিল বিরাট মহীকূহ। সেই সমস্ত শাস্ত্রই তো বেদের সত্যকেই আরো প্রকট করতে চেয়েছিল। কিন্তু

এক এক বিভাগেই এতো পুঁথি তৈরি হয়ে উঠেছিল যে, শেষ পর্যন্ত বিমুশ্কার মত পণ্ডিতও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—

অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং
স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিদ্বাঃ,
সারং ততো গ্রাহমপাস্ত্র ফল্গু
হংসৈর্যথাকীরমিবাস্তুমধ্যাং ॥

—সত্যিই শব্দশাস্ত্রের পার নেই, মানুষের আয়ুও অল্প আর বাধাবিলম্বও অনেক জীবনে, তাই অসার ত্যাগ করে শুধু সারটুকুই গ্রহণ করা উচিত, যেমন জলে দুধ মেশানো থাকলে হাঁস কেবল দুধটুকু খেয়ে জলটুকু ত্যাগ করে।

কিন্তু যা পুঁথি জড়ো হয়েছে আজ পর্যন্ত তাও যে অনেক, যদিও বহু পুঁথিই আর পাওয়া যায় না। এখন মুশকিল এই যে, কোনটুকু সার আর কোনটুকু অসার তা ঠিক করার সামর্থ্য কজনের আছে? তাই প্রায়শই দেখা যায় যে, মানুষ অসার বিচার ভার বহন করে। এ শুধু সেই প্রাচীন কালের শিক্ষার ব্যাপারেই নয়, বর্তমানকালেও ঠিক এই কাণ্ড হচ্ছে। ছাত্র কোন বিষয়ে শিক্ষা পেতে চান, তা আগে থেকে যদি তিনি ঠিক করতে না পারেন বা তাঁর গুরু তাঁকে ঠিক করে না দেন, তাহলে বৃথা পরিশ্রম, অর্থনষ্ট ও সময়কৃতিই ঘটে, ছাত্রের ভাগ্যে। কারণ সব বিষয়ে শিক্ষা পাওয়ার যোগ্যতা তো প্রত্যেকেরই নেই। আবার অতি বড় মেধাবী ছাত্রের পক্ষেও সর্ব-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়, কতগুলি বই তিনি পড়বেন একত্রে এখন তো এক এক বিষয়েই অসংখ্য বই লেখা হয়েছে এবং নিত্যই নতুন বই লেখা হচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, এখন আর কেউ সর্বজ্ঞ হয়ে উঠতে পারছেন না, এক একজন বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন মাত্র।

বেদচর্চার বাধা দূর করার উপায়

আদি বৈদিক যুগে পুঁথি ছিল কম, সকলের পক্ষে সেই পুঁথির সবগুলি আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল। সব থেকে বড় কথা, সে যুগে গুরু

ছাত্রকে অবাধ স্বাধীনতা দিতেন, একটি কোন জীবিকাবৃত্তির মাধ্যমে নিজের মত করে বিশ্বের সংগে পরিচিত হতে। অর্থাৎ প্রত্যেক ছাত্র তখন কর্মের সাহায্যে জ্ঞানলাভ করে নিজেকে আরো সম্পূর্ণ করে নিতে পেতেন। সেই কর্ম করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে তাঁকে নানা শাস্ত্র জানতে হতো, তাই সমগ্র বেদ তাঁর কাছে আর জটিল হয়ে উঠতো না। কর্ম না করে যাঁরা কেবল মুখস্থ করে জ্ঞানলাভ করতে যান, তাঁদের পক্ষে বেদ অনধিগম্য, যেমন অনধিগম্য তাঁদের পক্ষে স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করা। বেদ হচ্ছে কর্মসম্প্রদায় জ্ঞান, যে জ্ঞান এই জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য, এই কথাটি না বুঝতে পারলে বেদও বোঝা যায় না, এই জীবনকেও বোঝা যায় না।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও ফল

ইতিমধ্যে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটে গেল উনিশ শতকে, মহানুভব স্মার উইলিয়াম জোনসের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হলো এশিয়াটিক সোসাইটি। সেই সোসাইটির মাধ্যমে তিনি ভারতের সংস্কৃতির খোঁজ করতে গিয়ে, প্রথম অনুবাদ করে ফেললেন মহাকবি কালিদাসের নাটক, অভিজ্ঞানশতুতলম্। সেই ইংরাজী অনুবাদ পড়ে সাড়া পড়ে গেল সারা ইউরোপে। তখনকার দিনের জার্মান কবি গ্যেটে এক অপূর্ব কবিতায় প্রশস্তি জানানলেন কবি কালিদাসের সেই নাটকের। ওদেশের সবাই ব্যস্ত হলেন, ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডারকে উদ্ঘাটিত করতে। তারই ফলে ভট্ট মোক্ষমূলর শেষপর্যন্ত নাগরী অক্ষরে ছাপিয়ে বের করলেন আচার্য সায়ণের ভাষ্যসমেত চারিটি মূল বেদ। তার আগেও জার্মানী থেকে রোজেন সাহেব নাগরী অক্ষরে ঋগ্বেদ প্রকাশ করেছিলেন, তবে তার অনুবাদ করেছিলেন ল্যাটিন ভাষায়। ভট্ট মোক্ষমূলরের কৃতিত্বেই বহু ইউরোপীয় ও আমেরিকান পণ্ডিত বেদ নিয়ে রীতিমত চর্চা করবার অবকাশ পান এবং বহু জনে বহু অনুবাদ ও অনুশীলনও করতে শুরু করেন।

তাই ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ মোক্ষমূলরকে “ভট্ট” উপাধি দান করে সম্বর্ধিত করেন।

আমাদের দেশেও তার সাড়া এসে পৌঁছল, তাই শ্রদ্ধেয় রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ঋগ্বেদের বাংলা ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। বেদ সম্বন্ধে সারা ভারতেই তখন নবীন আগ্রহ দেখা দেয়। স্বামী দয়ানন্দের বেদ ব্যাখ্যা করার সম্বন্ধে আগেই বলেছি। তাঁর ব্যাখ্যা সর্বজনগ্রাহ্য না হওয়ায় প্রয়াগ থেকে ও মথুরা থেকে পণ্ডিতরা আরো ব্যাখ্যা বের করেন। বাংলায় “পৃথিবীর ইতিহাস” রচয়িতা পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ও বাংলা হরফে সাধারণ ভাষ্যসমেত চতুর্বেদ ও তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে বেদের চর্চা করার আগ্রহ ভারতের নানা স্থানে দেখা দেয়। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ইওরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতরা আমাদের চোখ ফুটিয়ে না দিলে, বেদের দিকে আবার আমাদের চোখ পড়তো কিনা সন্দেহ।

বর্তমানে বেদচর্চা

বর্তমানে ভারতের দক্ষিণ ও উত্তরে নানা স্থানে নানা চেষ্টা চলেছে বেদকে আরো প্রচার করার। এ সম্বন্ধে সব খবরই আমরা জানতে পাব, আমাদের কলকাতায় অবস্থিত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে, সেখানে বেদ সম্বন্ধে বিশেষ চর্চা করবার জন্তে একটি সমিতিও তৈরি হয়েছে। সেই সমিতির পক্ষ থেকেই অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য পিঙ্গলাদ শাখার অথর্ববেদ খুঁজে বের করে সবায়ের ধন্যবাদার্থ হয়েছিলেন। আবার সম্প্রতি লেকটরেসে একটি ‘বেদভবন’ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সে আবার অন্য কথা।

বেদের নিগূঢ় শিক্ষা ও উপসংহার

এতক্ষণে আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি যে, বেদের প্রথম বোধমানুষের এসেছিল কর্ম করতে করতে, বলাই বাহুল্য সে কর্ম হচ্ছে

হচ্ছন্দে জীবনধারণের কর্ম। ক্রমে সেই কর্মের পথে যত জাগলো ধনধান্যের প্রাচুর্য, তত দেখা দিল ভেদ। পৃথক হয়ে গেলেন কর্মী বা অশিক্ষিতের সংগে জ্ঞানী বা শিক্ষিতের। কে বড় তারই তর্কে দেখা দিল নানা আইন ও শৃংখলা, শেষ পর্যন্ত অস্ত্র বলে সেই আইন প্রয়োগ করা হলো। জ্ঞানীরা জানালেন তাঁরা চলেছেন দেবযানের উত্তরণের পথে, তাঁরা মায়া রাখেন না কিছু। আবার তাঁরাই বললেন, কর্মীরা চলেছেন পিতৃযানের অবতরণের পথে, তাঁরা থাকবেন চিরকাল বংশগত কর্ম করে মায়ায় আবদ্ধ। জ্ঞানীদের সঙ্গে কর্মীদের মিলন তাই কিছুতেই ঘটছে না। অথচ জ্ঞানীরা এই কর্মীদের উপরেই নির্ভর করছেন পদে পদে তাঁদের ভোগ রাগ বিলাস ব্যসন সব কিছুর জন্তে, পরিবর্তে দিচ্ছেন তাঁরা কর্মীদের ঘৃণা আর তিরস্কার, তারা মূঢ়, তারা বোঝে না কিছু। শেষ পর্যন্ত ছুঁৎমার্গের পাপে কিনরক তৈরি হয়েছে তার খবর আছে আমাদের দেশের হরিজন আন্দোলনের মধ্যে। জগতের মঙ্গলের জন্তে কাজ করতে গিয়ে, যারা মঙ্গলের মূর্তিমন্ত দেবতা শিবকে পূজো করে, সেই শিবের মন্দিরের দরজাও বন্ধ করে দিয়েছেন শিক্ষিতজনেরা ঐ অশিক্ষিত অন্ত্যজদের মুখের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত জগতে যতজন সিদ্ধপুরুষ জন্মেছেন, সবাই জন্মেছেন ঐ অশিক্ষিত কর্মী-জনের ঘরে। যাঁদের পায়ের ধুলো নিয়ে বহু বহু শিক্ষিতজন ধন্য হয়ে গিয়েছেন। স্বয়ং রামকৃষ্ণও তো ছিলেন তাঁদেরই একজন।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। সে হচ্ছে এই যে, প্রাগবৈদিক যুগের মানুষই বুঝতেন যৌথ চাষের জমি, যৌথখামার ও যৌথগোষ্ঠ। একত্রে সবাই চষতেন জমি। তাঁদের যিনি কুলপতি বা যুথপতি বা গণপতি, তিনি সবাইকে সমান ভাবে ভাগ করে দিতেন চাষের শস্তাদি। ঠিক এই নিয়ম আজো আছে,

বিভিন্ন আদিবাসী সমাজে। এমন কি সুদূর আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও।

শোনা যায়, ইওরোপের অভিযাত্রীরা ভুল করেই তাঁদের নাম দিয়েছিলেন “রেডইণ্ডিয়ান”। কিন্তু ঐ রেডইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যে সব রীতিনীতি বা গাথা প্রচলিত আছে, তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের রীতিনীতির চমৎকার মিল আছে। সম্প্রতি সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘দূরে বাইরে’ নাম দিয়ে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধটি লিখেছেন, তার থেকেই ঐ তথ্য জানা যায়। রেডইণ্ডিয়ানরাও আকাশকে বাবা ও পৃথিবীকে মা বলে থাকেন, শুনেই মনে পড়ে আমাদের বেদমন্ত্র—

দ্যোনিঃ পিতা পৃথিবী জনিতা ॥—আমাদের পিতা ছো বা আকাশ আর জননী হচ্ছেন পৃথিবী।

রেডইণ্ডিয়ানদের গাত্রবর্ণ হচ্ছে লালচে বা তামাটে। সেই কারণেই তাঁদের রেড নাম রটে যায়। আসলে তো ইওরোপীয় অভিযাত্রীরা ভেবেছিলেন তাঁরা ইণ্ডিয়াতেই পৌঁছেছেন। বাই হোক, আমাদের দেশে প্রাচীন যুগে যে রাক্ষস গোষ্ঠী ছিল, তাঁদের গায়ের রঙও ছিল অমনি, তাই তাঁদের বলা হতো কবুর বা লাল। আবার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল দাশগুপ্ত কিছুকাল আগে যে বই লিখেছেন, “রামায়ণে রাক্ষস-সভ্যতা”—তাতেও তিনি দেখিয়েছেন রাক্ষসরা বেদে কতখানি অধিকার রাখতেন। কে জানে, সেই প্রাচীন যুগের রাক্ষসরা ক্রমে দক্ষিণ আমেরিকায় ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে উঠেছিলেন কি না। একটি সত্য এই যে দক্ষিণ ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার পশুপাখী ও গাছপালার সাদৃশ্য বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পশু, পাখী, গাছপালা কি স্বেচ্ছায় অগ্ৰদেশে জন্মায়? আফ্রিকার মানুষরা যে আরো বোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছেন, তার কারণ প্রথর সূর্যের তাপ বলেই মনে হয়।

আজকেকারের গুণীজ্ঞানীজনেরা সকলেই রাজনীতির মাধ্যমে সহাবস্থান ও সহনশীলতার নীতি প্রচার করছেন দেশে দেশে। কিন্তু সেই প্রচারের যোগ্য ফল ফলছে না। সব থেকে ভেদের কারণ হয়েছে ঐ শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরব, আর সেই গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্তে বৈদিক যুগেও যেমন অগ্নি ও অস্ত্রের প্রয়োগ করা হয়েছিল, আজো তারি রীতি অনুসৃত হচ্ছে। উচ্ছেদ হচ্ছে তাই সমন্বয়ের বা কিছু বিধান, এমন কি সহোদর ভাইরা আর একান্নবর্তী থাকতে পারছে না। অথচ সেই একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শই আজকে বৃহত্তর রূপ নিয়েছে সোবিয়েৎ রাশিয়ায়। কিন্তু কি পরিতাপ যে দেশে প্রথম জেগেছিল সমবর্ণনের নীতি; যে দেশের মানুষ প্রথম বুঝেছিল যে, সংসারীদের নির্বিঘ্নে বাঁচতে দিতে হলে, সমাজের এক অংশকে সন্ন্যাস পালন করতে হয়, সেই দেশে আজ সবাই কেবল নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বুঝছে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোভ, অভিজাত বংশ মর্যাদা প্রভৃতি নানা গলদে ভরে গিয়েছে আমাদের সমাজ। আর এই গলদ বেশী করে জেগেছে শিক্ষিতদের মধ্যেই।

সেই যে গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন, না শুচঃ সম্পদং দৈবীম্ অভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥—হে পাণ্ডব, তুমি কোন চিন্তা করো না, তুমি দৈবীসম্পদের অধিকারী হবার যোগ্য (বা অভিজাত) হয়ে জন্মেছ।

সেই কথাই দিনে দিনে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়েছে আমাদের। দৈবী-সম্পদ বা বিড়াকেই আমরা ভেবে নিয়েছি, অম্মুরসম্পদ বা কর্ম-ক্রমতার থেকে বড়ো বস্তু। কিন্তু বিড়াতো কেবল বাক্যমাত্র। সে বাক্য কি পারে অন্ন তৈরি করতে, বুদ্ধির পথ দেখাতে?

বিদ্বানরা ভেবেছিলেন বা ভাবেন যে কর্মীর ঠিকই অন্ন উৎপাদন করে দেবে তাঁদের জন্ত, প্রাচুর্যের কোন অভাবই তাঁদের ঘটবে না।

এই অতি নির্ভরতা ও আশাই এনেছে আমাদের সমাজে অন্নসমস্যা। সেদিক থেকে কিন্তু অশিক্ষিতেরা যথেষ্ট এগিয়ে আছেন, শিক্ষিতদের চেয়ে। এখনো দূর গ্রামাঞ্চলে তাঁদের কর্মগুণে অন্নের অভাব নেই, এখনো সেখানে আছে একান্নবর্তী পরিবার, গ্রামের মধ্যে দুঃস্থ মানুষের প্রতি অবস্থাপন্নদের সজাগ দৃষ্টিও আছে। শুধু তাই নয়, সেখানকার সমাজ এখনো রীতিমত জীবিত। বাইরে ছোট্টেন না তাঁরা অন্নায়ের প্রতিবিধান চেয়ে। নিজেদের মধ্যেই একজনকে মোড়ল মেনে নিয়ে দোষীর বিচার করেন।

আজকে তাই ভেবে দেখার সময় এসেছে—শিক্ষা বলে, জ্ঞান বলে আমরা যার চর্চা করছি আর তারই দস্তে ফেটে মরছি—তা আমাদের সত্যি করে কি দিচ্ছে জীবনধারণের ব্যাপারে? অথচ এই জ্ঞান যার অপর নাম বেদ—তার মূল উদ্দেশ্যই তো। ছল বেঁচে থাকা ও বড় হওয়া। তবে কি সত্যিই আমরা বিচ্যুত হয়ে গিয়েছি—সেই আদিকালের বেদ বা ব্রহ্মবিদ্যা থেকে?

কেন আমরা স্বার্থপর? কেন আমরা স্ব-স্ব প্রধান? আবার কি পারব আমরা সেই মূলে ফিরে যেতে? কর্মীর সংগে জ্ঞানীর এই বিরোধের কথা এ যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জার্মান পণ্ডিত কার্ল মার্কস নিশ্চয় করেই বুঝেছিলেন। তাই তিনি তাঁর ‘কমুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো’তে ডাক দিয়ে গিয়েছেন, “ঈ ওয়ার্কাস অব দি ওয়র্ল্ড ইউনাইট”—হে বিশ্বের কর্মীবৃন্দ একত্র হও। কিন্তু সে আবার অন্য কথা।

আর একটি কথা বলেই শেষ করব বেদ পরিচয়ের কথা। মানুষ যেমন অন্ন পায় প্রকৃতির কাছ থেকে, কোন বিজ্ঞানবলে কোন কারখানা থেকে নয়, তেমনি জ্ঞানও পায় এই বিরাট বিশ্বলোক থেকেই। এই বিশ্বে অন্নও যেমন নিত্য সৃজিত হচ্ছে, জ্ঞানও তেমনি

নিত্য স্মাজত হচ্ছে। এই জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে
পাই, হৃন্দাসি যন্ত পর্ণানি॥—এই জগৎরূপ বৃক্ষের নিত্য সবুজ
পাতাই হচ্ছে হৃন্দাসি বা বেদ।

ঠিক এই কথা অন্ন সম্বন্ধেও তো খাটে। কেউই জানেন না কবে
প্রথম অন্ন সৃষ্টি হয়েছিল জগতে, যেমন কেউ জানেন না কবে বেদ বা
জ্ঞান সৃষ্টি হয়েছিল, তাই বলতে হয় বেদও যেমন অপৌরুষেয়, অন্নও
ঠিক তেমনি। আর তা আপনা থেকেই নিত্য জেগে উঠছে।

এই প্রসঙ্গে এ যুগের শ্রেষ্ঠ দুই বৈজ্ঞানিক ডই হয়েল সাহেব
আর নারলিকারজী বা বলেছেন বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে তাও মনে পড়ে।
তারা বলেন, বিশ্বের মূলে সব সময় একটি শক্তি জেগে আছে, যার
কাজই হচ্ছে সব কিছুকে বৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ঠিক সেইভাবে সেই মূলশক্তি আমাদের সবার কর্ম এবং জ্ঞানকে
নিয়ে চলেছে নব নব বিকাশের পথে, সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।
তাই উপনিষদের ঋষিরাও বলে গিয়েছেন, যম্ এব এষ বৃণুতে তেন
লভ্যঃ ॥—তিনি যাকে দেন, সেই তাঁকে পায়।

এই কথা দেহে মনে প্রাণে যেই বুঝি, তখনি তো আমাদের
কবিগুরুর ভাষায় আমরাও বলে উঠতে পাই,

সীমার মাঝে অসীম তুমি

বাজাও আপন সুর ॥

যাই হোক, এতক্ষণে আমরা বুঝে নিলাম, অন্ন ও বেদ দুয়েরি
মূল হচ্ছে আমাদের কর্ম। সেই কর্ম করবার শক্তিও আমরা লাভ
করছি সর্বদা মূলশক্তি থেকে। সুতরাং কর্মীদের সঙ্গে জ্ঞানীদের
ব্যবধান যেন দূর হয়ে যায় আমাদের জীবনে। দৈহিক পরিশ্রম যে
লজ্জার নয়, জীবনেরই বিকাশ, এ সত্য যেন ভুলে না যাই।

অশিক্ষিত ও শিক্ষিত সবাই যেন আমরা একত্রে হাত মিলিয়ে
উচ্চারণ করতে শিখি, সেই পরমতম বেদমন্ত্র—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং

সং বো মনাংসি জানতাম্ ॥

চলো একত্রে বলো একত্রে

ভাব একত্রে তাইরে ॥



পরিশিষ্ট

উপনয়ন সংস্কার

বেদের মধ্যে প্রবেশ করার যে বিধি ছিল পূর্বযুগে, এবার তারই একটু বিশ্লেষণ করা যাক। উপনয়ন-সংস্কারই ছিল বেদের মধ্যে প্রবেশ করার একমাত্র পথ। এ সংস্কারের অধিকার ছিল শুধু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের। এ সংস্কার অবশ্য এখনো হয় ঐ তিন বর্ণের, কিন্তু সে যেন নেহাৎ একটা অনুষ্ঠান মাত্র। উপনয়নের মূল উদ্দেশ্যই আমরা ভুলে গিয়েছি। এই উপনয়ন শব্দের অর্থই হচ্ছে আচার্য বা শিক্ষকের কাছে উপনীত হওয়া, তারপর তাঁর আশ্রমে বাস করে শিক্ষার শেষে সমাবর্তন বা পুনরায় নিজের ঘরে ফিরে আসা। বিভিন্ন বর্ণের পক্ষে বিভিন্ন নির্দিষ্ট বয়সেই এই উপনয়ন সংস্কার হতো।

ব্রাহ্মণের পক্ষে ছিল গর্ভাষ্টম বৎসর অর্থাৎ সাত বৎসর তিন মাস বয়স নির্দিষ্ট। শিক্ষার শুরু যে অল্প বয়সেই করা দরকার, সে কথা পূর্বযুগের আচার্যরাও জানতেন। বয়স বেশী হয়ে গেলে ছাত্রের পক্ষেও যেমন কঠিন হয় পাঠগ্রহণ করা, গুরুর পক্ষেও তেমনি কঠিন হয় পাঠ দান করা। অবশ্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের একটু বেশী বয়সেই শিক্ষা গ্রহণ করার নিয়ম ছিল। যাই হোক, সেই উপনয়ন সংস্কারই ওই তিন বর্ণের বালককে দ্বিজত্ব দান করে।

দ্বিজত্বের রহস্য

দ্বিজ শব্দের অর্থ হচ্ছে, যার দুবার জন্ম হয়েছে। মানুষ একবার জন্মলাভ করে মায়ের গর্ভ থেকে, দ্বিতীয়বার জন্মলাভ করে গুরুর

কাছে শিক্ষা পাওয়ার ফলে। শিক্ষাই দেয় মানুষকে দ্বিতীয় জন্ম। শাস্ত্রেও পাই, দ্বিতীয় জন্মের পিতা হচ্ছেন গুরু, আর মাতা হচ্ছেন বেদমাতা গায়ত্রী।

এই দ্বিতীয় জন্ম সম্বন্ধে বর্তমান যুগের মনীষীরা যা বলেন, তাও এই প্রসঙ্গে জানা দরকার। বর্তমান যুগে একটি অপূর্ব সত্য প্রকাশ করেছেন মনোবিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলেন, নবজাত শিশুমাত্রেই হচ্ছে একান্ত আত্মপর বা আত্মকেন্দ্রিক, যার ইংরাজী প্রতিশব্দ হচ্ছে, ইন্ট্রোভার্ট। তাই দেখা যায় শিশু কেবলি কাঁদে। সেই কান্নার কারণ এই যে, সবাই যেন নজর দেয় তার দিকে, সবাই যেন আদর-যত্ন করে তাকে। শিশুর চেষ্টা কেবলি নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করার, সেটুকু না পেলেই সে কাঁদে। ক্রমশঃ সে যত বড় হয়ে ওঠে, তত দেখে যে তার চারিদিকে আরো অনেক ব্যক্তি ও বস্তু রয়েছে। জগতে সে একা নেই। তখন সে নিজে থেকেই চেষ্টা করে এ জগতের সব কিছুর সংগে নিজেকে মিলিয়ে নেবার, সবার প্রতি দৃষ্টি দেবার। অর্থাৎ ধীরে ধীরে সে হয়ে ওঠে বিশ্বকেন্দ্রিক, যার ইংরাজী প্রতিশব্দ হচ্ছে, এক্সট্রোভার্ট। অবশ্য নিজেকে ছাড়া অন্য সবাইকে চিনে নেবার সুযোগ সে পায় প্রথম মা ও বাবার কাছেই। তাই মা ও বাবার তুল্য গুরু নেই, শাস্ত্রে তাঁদের বলা হয় মহাগুরু।

যদি কোন জাতক বয়সকালেও ঠিকমত বিশ্বকেন্দ্রিক না হয় অর্থাৎ সবায়ের দিকে দৃষ্টি দেবার বা সবায়ের কথা ভাববার চেষ্টা না করে, তখনই তাকে সবাই বলে স্বার্থপর, অমানুষ। তাকে তখন পশুর মতই বলা যায়। কারণ পশুরাও বোঝে শুধু নিজেরই তৃপ্তিটুকু। কিন্তু মানুষ তো পশুর ধাপ থেকে উঁচুতে উঠেছে বলেই মানুষ নাম পেয়েছে। সেই উঁচুতে ওঠার একমাত্র উপায় হচ্ছে স্বার্থের পথ ছেড়ে পরার্থের পথে চলা। গুরুই দেন ছাত্রকে সেই মহৎ পথের নির্দেশ, সুশিক্ষা দান করে। তবে সেই শিক্ষা গ্রহণ করার শক্তি ও যত্ন থাকা চাই ছাত্রের, এ কথা বলাই বাহুল্য।

যাই হোক, এতক্ষণে বোধ হয় আমরা বুঝতে পেরেছি দ্বিজেশ্বর
রহস্যটুকু। নিজে কে ভুলে পরের দিকে যিনি চাইতে জানেন তিনিই
হচ্ছেন দ্বিজ।

সন্ধ্যাবিধির প্রয়োজন

উপনয়নের প্রথম সোপান হচ্ছে সন্ধ্যাবিধি। এই সন্ধ্যা শব্দের
অর্থ হচ্ছে সম্যক রূপে ধ্যান করা। সেই ধ্যানের দ্বারা বা চিন্তার
দ্বারাই আমরা বুঝে নিতে পাই, আমাদের মধ্যে কোথায় কি দোষ
বা গুণ আছে, বা কি প্রেরণার অভাব আছে। তখনকার কালে
প্রতিদিন সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে এই সন্ধ্যা বন্দনা
করার নিয়ম ছিল, নিজের সম্বন্ধে সম্যকভাবে সচেতন হবার জন্য
আবার এই সন্ধ্যাই হচ্ছে—জীবনে বা সন্ধিত বা গ্রন্থিত হয়ে আছে
তাকে ভেদ করার উপায়। সেদিক থেকে সন্ধ্যা হচ্ছে বদ্ধ ঘর খুলে
নেবার চাবিকাঠি।

ত্রিসবন ও ত্রিসন্ধ্যা

অনেকে মনে করেন বৈদিক যুগে যে ত্রিসবন-ক্রিয়া ছিল ; প্রাতঃ
সবন, মাধ্যহ্নদিন সবন ও সায়াংসবন নামে, উত্তরকালে তারই পরিণতি
ঘটেছে ঐ ত্রিসন্ধ্যায়। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে ত্রিসবন
ছিল দিনে তিনবারের আহারের ব্যবস্থা করা, সেই আহার সময়ে
চিন্তা করে নেবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল যে কোন্ পুষ্টির অভাব
আছে দেহে, প্রাণে ও মনে।

গায়ত্রীর অর্থ

যাই হোক, সন্ধ্যাবিধির মূলমন্ত্রটি হচ্ছে গায়ত্রী। সেটি হলো—

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং

ভর্গোদেবশ্চ ধীমহি

ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

—সেই দীপ্তিমান সবিতা, যিনি প্রসব করেছেন সমস্ত জগৎকে, তাঁর বরণীয় তেজোরাশিকে ধ্যান করি বা ধারণ করি, যিনি আমাদের ধী সকলকে পরিচালনা করেন।

এ মন্ত্রের ঐ ধিয়ঃ শব্দের অর্থ ভারি মজার। এক অর্থ হচ্ছে কর্ম, আর এক অর্থ হচ্ছে প্রাণ আর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি। তাই ঐ শব্দটি প্রয়োগ করায় মন্ত্রটির এই অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে, আমাদের দেহের কর্মশক্তি, প্রাণের জীবনীশক্তি এবং মনের বুদ্ধিশক্তিকে তিনি পরিচালনা করুন, যেন জীবনে বিকশিত হয়ে ওঠে সবদিকের পরিপূর্ণতা।

প্রেরকের প্রয়োজন

এই পরিচালনা বা প্রেরণা না পেলে কারোর জীবনেই প্রসার জাগে না। তাইতো সব থেকে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটি পরিচালক বা প্রেরক। আচার্য আমাদের সম্মুখে দেখিয়ে দেন শ্রেষ্ঠ তেজের আকর ঐ সবিতাকে, যার থেকে প্রেরণা পায় বিশ্বের সমস্ত বস্তু ও ব্যক্তি। একথা আজকের দিনের বৈজ্ঞানিকরাও জানেন, ঐ সবিতা বা সূর্যের রশ্মি থেকেই এ পৃথিবীর তাবৎ পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের তাই অভিজ্ঞজনেরা সবিতার অর্থ করেন প্রসবিতা অর্থাৎ যার থেকে সব কিছু জন্মায়।

গায়ত্রী মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

বিশেষ লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে, যদিও ঐ গায়ত্রী মন্ত্র ব্যক্তিগতভাবেই জপ করবার নির্দেশ আছে শাস্ত্রে; কিন্তু ঐ মন্ত্রের শেষ পাদ থেকে জানতে পাই যে, এ মন্ত্র কেবল একার ব্যক্তিগত প্রার্থনার নয়। তাই ঐ মন্ত্রের শেষ পাদে “নঃ” শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে, যার অর্থ আমাদের সবায়ের। বেদের তাবৎ মন্ত্রেই পাই এইভাবে বিশ্বগত কল্যাণের প্রার্থনা।

গুরুর মহত্ব

গুরুই তো দেন আমাদের চোখ ফুটিয়ে ঐ সূর্যের সঙ্গে আমাদের
সম্বন্ধ বুঝিয়ে দিয়ে। আমাদের শাস্ত্রে গুরুর প্রণাম মন্ত্রেও পাই,

অজ্ঞানতিমিরাক্ষয়

জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন

তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

—অজ্ঞানের অন্ধকারে অন্ধ চক্ষুকে যিনি জ্ঞানের অঙ্গনশলাকা
দিয়ে উন্মীলিত করে দেন, সেই সর্বসুন্দর গুরুকে প্রণাম করি।

অজ্ঞান শব্দের অর্থ কিন্তু জ্ঞানের অভাব নয়, আসলে অজ্ঞান
বলতে বোঝায় অল্প জ্ঞান। সেই অল্প জ্ঞানকে গুরু উদ্ধে দিয়ে
উজ্জ্বল করে তোলেন। অল্প জ্ঞান বা সহজাত জ্ঞান নিম্নস্তরের
প্রাণী বা পশু পাখীর মধ্যেও আছে। তাই দেখা যায় সার্কাসের
শিক্ষকরা পশুদেরও নিয়ম করে শিক্ষা দিয়ে নানা খেলা শেখাতে
পারেন। পাখীদেরও নিয়ম করে শেখালে তারা অনেক কিছুই
শেখে। কোন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে হলে তাই নিয়ম মেনে
শিক্ষা করতেই হবে। সে কথা আমাদের পূর্বাচার্যরা জানতেন বলেই
নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন দিনে তিনবার সন্ধ্যাবন্দনার।

সবিতার প্রয়োজন

কিন্তু সবিতাকেই বা প্রেরণার জন্তে সাধতে যাব কেন? কারণ
হচ্ছে এই যে, বাবা, মা বা বিভিন্ন গুরুরা আমাদের জীবনে কেউ
চিরস্থায়ী নন। সবিতা বা সূর্য কিন্তু নিত্যকাল জেগে আছেন
আমাদের সম্মুখে। প্রকৃতপক্ষে এই সূর্যই অনাদিকাল থেকে
আলোর আকর, তিনি নিয়ে আসেন প্রভাত, উজ্জীবিত করেন

প্রত্যেককে কর্মের প্রেরণা দিয়ে। সে কথা যজুর্বেদের প্রথম
মন্ত্রটিতেই পাই। সেখানে বলা হয়েছে,

সবিতা প্রার্পয়তু

শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে ॥

—সবিতা যুগয়ে দিন আমাদের কাছে যা শ্রেষ্ঠতম কর্ম।

আবার সঙ্ক্ৰাবন্দনার শেষে সূর্য্যার্য্য দেবার মন্ত্রেও পাই, সবিত্রে
কর্মদায়িনে ॥—সবিতাই দান করেন কর্ম।

জীবনের ক্ষেত্র ও বিস্তার

মূলতঃ আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আছে তিনটি ক্ষেত্র, যে
তিনটির বিস্তার আমরা সবাই কামনা করি। সেই ক্ষেত্র তিনটি
হচ্ছে, প্রথম আমাদের দেহ বা কর্ম, দ্বিতীয় আমাদের প্রাণ বা আয়ু;
আর তৃতীয় হচ্ছে আমাদের মন বা জ্ঞানবুদ্ধি। সেই তিনটি ক্ষেত্রের
কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্তেই ঐ গায়ত্রী মন্ত্রের আদিত্যে যোগ
করা হয়েছে ব্যাহতি বা ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ।

এই ভূঃ হচ্ছে আমাদের দেহের প্রতীক, ভুবঃ হচ্ছে আমাদের
প্রাণের প্রতীক আর স্বঃ হচ্ছে আমাদের মনের প্রতীক। এই
তিনটির যা বৃদ্ধি তার পরম প্রসারই আমাদের কাম্য ও সাধ্য। এই
বৃদ্ধির সাধনার এক নাম ত্রিবৃৎকরণ।

ত্রিবৃৎকরণের রহস্য

দেহ সাধনার ফলে আমরা লাভ করি সহঃ বা সহশক্তি। তারই
অপর নাম হচ্ছে আধিতৌতিক শক্তি, যে শক্তিবলে দেহের রোগকে
সহ করে নেওয়া যায়। ইংরেজরাও এ কথা জানেন, তাই তাঁদের
ভাষায় রোগীকে বলা হয়, 'পেশেন্ট'। 'পেশেন্ট' শব্দটির আর এক
অর্থ সহনশীল। বাস্তবিক দেখা যায় যে রোগীর সহশক্তি কম, তার
চিকিৎসা করা অতি বড় চিকিৎসকের পক্ষেও দুষ্কর।

প্রাণসাধনার ফলে আমরা লাভ করি ওজঃ বা তেজ। যার অপর নাম হচ্ছে আধিদৈবিক শক্তি। সেই শক্তি বলে সমস্ত বাধা, কুঠা ও সংকোচকে দূর করা যায়। এই ওজঃশক্তি আবার বাক্শক্তির সঙ্গে একাত্ম। তাই ভাল বক্তাকে আমরা বলে থাকি ওজস্বী বক্তা, আর তাঁর মুক্তকণ্ঠেব ভাবাকেও বলি ওজস্বিনী। ইংরাজী “লিবার্যাল” শব্দটিরও তো মূল অর্থ ওই। “লিবার্যাল” শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে ল্যাটিন ভাষার “লিবার” শব্দ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে মুক্ত।

আর মনঃসাধনার ফলে লাভ করি বল বা অভয়। যার অপর নাম হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তি। সেই শক্তি বলে মৃত্যুর মত মহৎ ভয়ও দূর হয়ে যায়। ইংরাজী ভাষাতেও পাই “ভ্যালিয়ান্ট” শব্দ, যা নিষ্পন্ন হয়েছে ল্যাটিন ভাষার “ভ্যালিও” শব্দ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে বল। কেউ কোন কাজে পশ্চাৎপদ হলে, আমরা বলি, “ওর মনের বল নেই, তাই পিছিয়ে এলো।” এই মনের বলই হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তি, কিন্তু তা একেবারেই লাভ করা যায় না। আগে লাভ করতে হবে দেহের সহশক্তি বা আধিভৌতিক শক্তি, তারপরে লাভ করতে হবে প্রাণের ওজঃশক্তি বা আধিদৈবিক শক্তি, তবে শেষ পর্যন্ত লাভ হবে ঐ মনের বল বা আধ্যাত্মিক শক্তি।

পূর্ণ গায়ত্রী

আর এই তিনের সম্যক বিকাশ ঘটলে লাভ করা যাবে সমগ্র বিশ্বের সংগে যুক্ত হবার পরাশক্তি বা আধিযাজ্ঞিক শক্তি, যার প্রতীক হচ্ছে একাক্ষর প্রণব। পূর্ণ গায়ত্রীর রূপ হচ্ছে তাই:

ওঁ ভূৰ্ভবঃ স্বঃ

তৎ সবিতুৰ্বরেণ্যং

ভর্গোদেবশ্চ ধীমহি

ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

গায়ত্রী নামের অর্থ

গায়ত্রী নামটি কেন হলো তাই বলি। শাস্ত্রে পাই,

গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ

গায়ত্রী ত্রমতঃ স্মৃতা ॥

—যে তোমাকে গান করে তাকেই যেহেতু তুমি ত্রাণ কর, তাই গায়ত্রী নামে তুমি স্মরণীয়।

অনেকে বলেন যে, যেহেতু অন্ততঃ তিনবার গায়ত্রী গান করা বা জপ করার বিধি আছে, তাই ঐ মন্ত্রের নাম গায়ত্রী। কিন্তু শাস্ত্রে তেমন কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না।

প্রণব ও ব্যাহতি উদ্ভব

প্রণব ও ব্যাহতি সম্বন্ধে আরো জানা যায় যে, ঋগ্বেদ থেকে ভূঃ, যজুর্বেদ থেকে ভুবঃ আর সামবেদ থেকে স্বঃ সংকলিত হয়েছে। প্রণব বা ওঁ তেমন সংকলিত হয়েছে অথর্ববেদ থেকে।

ব্রহ্মবিচার বিভিন্ন নাম ও কারণ

ভূলোক থেকেই আমরা সন্ধান পাই অগ্নির। সেই কথা স্মরণে রেখেই ব্রহ্মবিচার নাম দেওয়া হয়েছে অগ্নিবিদ্যা। সেই অগ্নি, বৈশ্বানর নামে, আমাদের সবায়ের নাভিমণ্ডলে অবস্থিত। তারই সাহায্যে পরিপাক করতে পারি আমরা সমস্ত অন্ন, পুষ্টিলাভ করি দেহের, প্রসার জাগে আমাদের ইচ্ছাশক্তির। দার্শনিকরা সেই ইচ্ছাশক্তির নাম দিয়েছেন সং অর্থাৎ আমি আছি এই বোধ।

ঐ অগ্নির ক্রিয়া থেকেই জাগে উদক বা রস, যার সঞ্চার ও বিস্তার ভুবলোকে। সেই কথা স্মরণে রেখেই ব্রহ্মবিচার নাম হয়েছে মধুবিদ্যা। সেই উদক, রক্ত নামে, আমাদের হৃদয়মণ্ডলে অবস্থিত। সেই রক্তই সমস্ত দেহে ছড়িয়ে যায় ও পুষ্ট করে

আমাদের প্রাণকে, প্রসার লাভ করে আমাদের ক্রিয়াশক্তি।
যাকে দার্শনিকরা বলেন চিং অর্থাৎ আমি জানি বা করি এই বোধ।

অগ্নি আর উদকের বিস্তৃতির ফলে জাগে মরুৎ, যার স্থান স্বর্লোকে। সেই মরুৎ নিরবধি প্রবাহিত হচ্ছে আমাদের মুখ-
মণ্ডলে। তারই সাহায্যে ঐ অগ্নি এবং উদক আরো প্রসার লাভ
করে। সেই মরুতের কথা স্মরণে রেখেই ব্রহ্মবিচার নাম হয়েছে
শাণ্ডিল্যবিদ্যা। সেই মরুতের বলেই আমরা জানতে পাই যে,
বিশ্বের জড়জংগম সবই হচ্ছে, ব্রহ্মময় সবার মধ্যেই চলেছে মরুতের
ক্রিয়া বা স্পন্দন। তখনি তো প্রসারিত হয় আমাদের মনের
জ্ঞানশক্তি। যাকে দার্শনিকরা বলেন আনন্দ অর্থাৎ আমি আনন্দ
পাই এই বোধ।

প্রণবের রহস্য

এখন ওই অগ্নি, উদক ও মরুৎ এই তিনটি শব্দের প্রথম অক্ষর
গুলি হচ্ছে—অ, উ, ম। এই অ+উ+ম=ওঁ শব্দটি পেয়ে বাই।
শাস্ত্রেও পাই অ, উ ও ম এই তিনটি অক্ষর যুক্ত হয়েই প্রকাশ করেছে.
ওঁ শব্দটি। শাস্ত্রান্তরে আবার পাই, সঃ অর্থাৎ নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ
ও অহ্ম অর্থাৎ প্রশ্বাস টানার শব্দ একত্র হয়ে সোহহ্ম শব্দ জাগে।
সেই সোহহ্ম শব্দ থেকে স ও হ এই দুটি অক্ষর বাদ দিলেই ওম্ বা
ওঁ অবশিষ্ট থাকে। অনেকে মনে করেন ত্রিবৃৎকরণের সহঃ, ওজঃ
ও বলের মধ্যভাগে অবস্থিত ওজঃ শব্দের প্রথম অক্ষর থেকেই ওঁ বা
ওম্ বীজ জেগেছে।

সারকথা

আরো এক কথা জানা যায়, সমগ্র বেদের সারভাগ হচ্ছে
সম্ভাবনানার মন্ত্রগুলি, আবার সম্ভাবনানার সারভাগ হচ্ছে গায়ত্রী
মন্ত্রটি, আর গায়ত্রী মন্ত্রেরও সার হচ্ছে ঐ ওঁ শব্দটি। এই ওঙ্কারের

স্বাধি হচ্ছেন ব্রহ্ম, ছন্দঃ হচ্ছে গায়ত্রী, আর দেবতা হচ্ছে অগ্নি ; সব কিছু কর্মেই ওঙ্কারের প্রয়োগ। তাই যদি কেউ সন্ধ্যাবন্দনা সমগ্রভাবে নাই করতে পারেন কেবল গায়ত্রী মন্ত্রটি জপ করেই সফল হতে পারেন ; আর গায়ত্রী মন্ত্রও কেউ যদি জপ করতে না পারেন, তিনি শুধু ওই ওম্ জপ করেই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বোঝা যায় এই যে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের আদিতো যে অগ্নি অন্তেও সেই অগ্নি। এই অগ্নি যেন কখনো নির্বাপিত না হয়—এই হচ্ছে মূল লক্ষ্য সমস্ত বেদের শিক্ষার মধ্যে।

জপের ফল

এখানে জপের কথাও কিছু বলি। জপই হচ্ছে সমস্ত শক্তি লাভের মূল। সে কথা নিশ্চিতরূপে জানতে পাই গীতার দশম অধ্যায় থেকে। সেখানে শ্রীভগবান বলেছেন, যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোহস্মি ॥—যত প্রকারের যজ্ঞ আছে, তার মধ্যে জপরূপ যজ্ঞই স্বয়ং আমি।

এই জপই ছিল মুনি বশিষ্ঠের মূলধন, তার প্রমাণ পাই বাল্মীকির রামায়ণে। সেখানে বারবার বশিষ্ঠকে বলা হয়েছে, জপতাং বর ॥ অর্থাৎ যারা জপ করেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সেই জপের ফলেই তিনি লাভ করেন সর্বশক্তির পরম প্রকাশ স্বরূপ ব্রহ্মতেজ, হয়ে ওঠেন সর্বজনমাণ্য। বাস্তবিক যে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে না পারে সে আর বিশ্বের কোন কাজে লাগবে? তাই আমাদের প্রত্যেককে লাভ করতে হবে ব্যক্তিগত উন্নতি, সুরিত করে তুলতে হবে নিজের নিজের অন্তরস্থ শক্তিকে সমগ্রভাবে, যা ঐ জপের দ্বারাই সম্ভব।

প্রাণায়ামের ফল

তখন আমরা এই বিশ্বের মধ্যে নিজস্ব স্থান লাভ করব, তখন আমরা পারব বিশ্বমৈত্রীর যোগ্য ধারক ও বাহক হয়ে উত্তরোত্তর সপ্তলোকের গতি লাভ করতে। সেই সপ্তলোকের গতির কথাই পাই সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে প্রাণায়ামের মন্ত্রগুলিতে।

প্রাণায়াম শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাণের বিস্তার, আবার প্রাণ শব্দের অর্থও হচ্ছে প্রকৃষ্ট গতি।

নিয়মিত অভ্যাস

কি জপ আর কি প্রাণায়াম, দুইই হচ্ছে নিয়মিত অভ্যাস। নিয়মিত অভ্যাসের ফল যে কি অমোঘ, তা এ পৃথিবীতে কারো অজ্ঞাত নয়। মনে পড়ে গীতায়ও অর্জুনকে শ্রীভগবান ঐ অভ্যাস-যোগেরই উপদেশ দিয়েছিলেন।

আবার ইংরাজিতেও একটি প্রবাদ আছে—“প্র্যাক্টিস্ মেক্‌স্ পারফেক্ট্”—অভ্যাসই জাগায় পরিপূর্ণতা। এই অভ্যাস হচ্ছে ক্রিয়ারই অন্য নাম।

পরমগতি

সবশেষে একটি কথা যেন আমাদের মনে থাকে যে, এই ভূলোক বা দেহকে ধরেই আমাদের যাত্রা শুরু। ক্রমে উত্তরায়ণের পথে ভুবলোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক পার হয়ে পৌঁছে যাব সত্যলোকে, কিন্তু গতি আমাদের যেন কোথাও গিয়ে ব্যাহত না হয়, অবাধ আনন্দে যেন বিচরণ করতে পাই লোকে লোকে সকলের সংগে একান্ত সখে। সেইতো এই জীবনের পরম লক্ষ্য, পরম গতি।

সুগা নো বিশ্বা সুপথানি সন্ত ॥

সুগম হোক মোদের কাছে।

সুপথ যত বিশ্বে আছে ॥

॥ সমাপ্ত ॥

प्रमाणिक

प्रमाणिक यह है कि श्री ...
...
...
...
...
...
...
...

प्रमाणिक

प्रमाणिक यह है कि श्री ...
...
...
...
...
...
...
...

assures from many knowing that Janata V.I.P.s are in the lions and Not pockets of these 'Con-cessions when barons Aluminium trialists ! prices were abruptly raised by 'Aluminium Kings' led by Birlas me con-her from

(Contd on page 4)

Simla vote of confidence would not only decide the fate of Himra-chal chief minister, but the same would affect the destinies of other C.Ms too. If Shanta Kurrar remains in Himra-chal Jan Sangh would this month through the

this question yet another related and relevant question needed to be answered. Is Bihar J.S. unit a monolithic structure? Answers to both these questions couldn't be available during this month through the

he new kings.

Economic Front

bewildered scene

Splinter's Economic Bureau

houses never a good time as feel under Government. worry seems gher-criticism under a press grip is their mer- designs. The disor- position divid- among Janata bewildered.

THE CONSUMERS

are increasing, to continue to

within bounds because they were the

Bihar Political Scene

Anxious moments for Karpoori

From SPLINTER's Political Correspondent

Karpoori Thakur could tackle the problems that faced him before Phulparas election. But he has to spend many anxious days during coming three months as number of his critics are increasing every day and he has to stir through opposition. There is lull in Bihar's political front but the same is definitely not permanent and many insiders claim that storm may burst in February. Karpoori Thakur knows this and it would need greater tact than he has hitherto been applying to tackle the political situation.

continue to play dominant role in state politics everywhere in North India. But if he goes and a non-Jan Sanghi comes as C.M it would affect the appereat of B.L.D.-J.S unity in U.P & Bihar. Even otherwise Himachal experiment would polarise state politics between Jan Sangh & non-J.S. In Bihar the story is entirely different. In this state non-Madhu Limaye Socialist group is not prepared to tolerate BLD dominance, they neither have guts to break the same. If Jan Sangh moves away from BLD what would be the result?

questions are uppermost in mind of pro and anti Jan Sangh. The fact that mains that are creeping in minds of creators belongs to Jan Sangh while Jan Sangh gradually is coming to a cumbing to activity and due to J.S.B. Then there is a gap between Jan Sangh and Kailash groups. In most of the are with Mishra. Has he gained through between created in